সঙ্কলয়িতার নিবেদন।

এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ-পুস্তক খানার জন্য প্রবন্ধনির্ব্বাচন কালে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে ; প্রথম, ভাব ও তদনুগত রচনাভঙ্গী ; দ্বিতীয়, আমাদের ইংরেজি ও বাঙ্গালা স্কুলের মধ্যশ্রেণীর ছাত্রগণের প্রকৃত অভাব।

প্রথম উদ্দেশ্যের পূরণ কল্পে বঙ্গভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণের অধিকাংশের রচনা হইতেই এক একটি (কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে দুইটি) প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় কৃতী লেখকের অভাব নাই এবং কি শব্দসম্পদে—কি ভাববৈচিত্র্যে বাঙ্গালা ভাষা এখন মহৈশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ জগতের অপর কোনও দেশের সাহিত্য এত অল্পকালে এত অধিক উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। সে বড় বেশি দিনের কথা নয় যেদিন বঙ্গভূমির সুসন্তান, বাঙ্গালীর গৌরব, পুণ্যশ্লোক ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও সমুন্নত সুরুচির গঙ্গাজল-স্পর্শে অনাদৃত, অসংস্কৃত, ভাবহীন, রসহীন বঙ্গভাষাকে বিশুদ্ধ করিয়া তাহাকে আপনার 'অপত্য-কৃতিকা' করিয়া লইয়াছিলেন ও যে দিন নির্ব্বাসিতা সীতার করুণ বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে অবজ্ঞাতা বঙ্গভাষা আপনার গৃহে রাজরাজেশ্বরী রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বঙ্গ ...হিত্যের সেই শুভ দিন হইতে অদ্য নব্য বাঙ্গালার লেখক-...ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-তারিখের একপঞ্চাশত্তম ...দিন পর্য্যন্ত কত কত প্রতিভাশালী লেখক স্বীয় ...জ্যোতিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌষ্ঠব সম্পাদন ...র কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিলে যুগপৎ আনন্দে ...ল্ল ও স্ফীত হইয়া উঠে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে

বঙ্গসাহিত্যাকাশের এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সম্মিলিত অংশুধারার একটি ক্ষীণ প্রতিবিম্ব উৎপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করি সদ্বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি ও বিকাশের একটা ক্রম লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

সাহিত্যচর্চ্চার সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লেখকগণের রচনার আদর্শ একত্র সঙ্কলন করিয়া নানারূপ সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করিবার প্রথা পাশ্চাত্যদেশে খুব প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে, এডিনবরার W. P. Nimmo, Hay, & Mitchell কর্ত্তৃক প্রকাশিত The English Essayists, বা আমেরিকার G. P. Putnam's Sons কর্ত্তৃক প্রকাশিত Select British Essayists শ্রেণীর পুস্তক সঙ্কলিত হইবার দিন অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণমেণ্ট এবং পাঠ্যনির্ব্বাচন-সমিতি বাঙ্গালা রচনার ও বাঙ্গালা চর্চ্চার ক্রমশঃ যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তাহাতে উদ্যমশীল সঙ্কলক ও প্রকাশকগণের অচিরেই এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে হয়ত সুবিধাও উপস্থিত হইতে পারে।

যাহা হউক, বর্ত্তমান গ্রন্থ মধ্যশ্রেণীর ছাত্রগণের অভাব মোচন কল্পেই সঙ্কলিত হইয়াছে। সেই জন্য সাহিত্য-পাঠে তাহাদের উৎসাহ-বৃদ্ধির পক্ষে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের পরিপুষ্টিসম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি, ততটুকু যাহাতে অল্লায়াসে অর্জ্জন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রব একটি করিয়া সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ প্রদান করিয়াছি প্রবন্ধলেখকের ভাষা ও রচনাভঙ্গীর বিশেষ বিষয়সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা ক বিষয়সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভাস দেওয়ার উদ্দেশ্

নিতান্ত অজ্ঞতা নিবন্ধন যেন প্রথম হইতেই প্রবন্ধের অর্থ ও প্রসঙ্গ বোধে ছাত্রগণের কোনও রূপ কষ্ট না হয়।

অনেক কৃতী লেখকের লেখাই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় নাই। তাহার কারণ, একদিকে যেমন রচনাভঙ্গীর বৈচিত্র্যপ্রদর্শন আমার একতর উদ্দেশ্য, অপরদিকে যাহাদের জন্য এই পুস্তক অভিপ্রেত তাহাদের অভাব ও তন্নিবারণ পক্ষে প্রবন্ধের উপযোগিতা-নিরূপণও আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিয়াছি। সেই জন্য সঞ্জীবচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র (সরকার), চণ্ডীচরণ, দামোদর, হরপ্রসাদ, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণের রচনা সংগৃহীত হয় নাই।

'চিত্রদর্শন' প্রবন্ধের মুখবন্ধে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই বঙ্গ-ভাষার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি; ইহাতে মতভেদ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করি না। বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের অভ্যুদয় প্রচ্ছন্নবৌদ্ধগ্রন্থ 'শূন্য পুরাণে'ই হউক বা বৈষ্ণব কবিগণের কড়চায়-ই হউক, রাজীবলোচন রায়, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় তর্কলঙ্কার প্রভৃতি হইতে তাহার প্রকৃত বিকাশ আরব্ধ হয়। রামমোহন রায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি তাহাতে গভীর ভাবের অবতারণা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রসসঞ্চার করিতে পারেন নাই, এবং বাক্যাবলীর সংযোজনায়ও কেহ শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। গদ্যসাহিত্য যেন প্রকৃত সংস্কারের অর্থাৎ দোষসংশোধন ও গুণাধান এই উভয়ের জন্য বহু-[illegible]াল হইতে বিদ্যাসাগরের নিপুণ লেখনীর স্পর্শ প্রতীক্ষা করিতেছিল। [illegible]ই যেদিন তিনি মার্শাল সাহেবের পরামর্শে বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ [illegible]লেন, সেই দিন হইতেই যেন তাহা দ্রুতপদে উন্নতির পথে অগ্রসর [illegible]ত লাগিল। বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন, "প্রাঞ্জলতার কুসুমিত [illegible]ণে সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের যুগপৎ সমাবেশ করিয়া

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যকে চিরগৌরবার্হ বেশে জগৎসমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন।"

ভাব ও রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক কথা লিখা বাহুল্য মাত্র। এখন প্রবন্ধগুলির বিষয়সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থখানা মধ্যশ্রেণীর ছাত্রগণের জন্য অভিপ্রেত ও তাহাদের অভাবপূরণ এই গ্রন্থসঙ্কলনের অন্যতর উদ্দেশ্য। সুতরাং যেরূপ বিষয়ের সমাবেশ করিলে ভাষা ও রচনা-প্রণালী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির সাহায্য হয়, সন্দর্ভ-চন্দ্রিকায় তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিক্ষাতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের এই অপূর্ব্বলক্ষিত উন্নতির দিনেও কতক-গুলি নীরস ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, এবং সূত্রাকারে নীতি-শাস্ত্রের কতকগুলি মূল উপদেশ শিক্ষা দিয়া অল্পদিনে 'সুকুমারমতি বালকবালিকাগণ'-কে সুবোধ ও সুশীল করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এরূপ কথা বলা যায় না। অনেক কৃতী গ্রন্থকারই অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, মানবশিশুর হৃদয় ও মনের অর্গল 'Open sesame'-এর ন্যায় সংক্ষিপ্ত উন্মোচনমন্ত্রের উচ্চারণমাত্রেই উন্মুক্ত হয় না। সাহিত্য শিক্ষার ছলে সরস ও কৌতুকপূর্ণ ভাষায় প্রকৃতির কোনও বিভাগের কোনও বিচিত্র তত্ত্বের বর্ণনা তাঁহাদের সম্মুখে ধরিতে পারিলে, তাহারা সহজে ও অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞানে আসক্তি লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রলোক', ও রামেন্দ্রসুন্দরের 'পৃথিবীর বয়স', ঐরূপ সরস ভাষা লিখিত হওয়ার দরুণ ছাত্রগণের যত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও ভূবিদ্যাসম্বন্ধী কোনও গ্রন্থের তত্ত্ববিষয়ক অধ তাঁহাদের হস্তে স্থাপন করিলে তদ্রূপ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা না

বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্বন্ধে যে কথা, নীতিশিক্ষা ও ইতিহাসশিক্ষা সম্বন্ধেও ঐ কথা। 'কটু বাক্য কহা অনুচিত' ইত্যাকার নীরস উপদেশবাক্যাবলী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত না করিয়া রামচন্দ্র, মহম্মদ, যুধিষ্ঠির ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় ধর্ম্ম ও চরিত্রবলে বলবান্ মহাপুরুষ-গণের চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও মহিমা, বাঙ্গালা ভাষার প্রধানতম লেখক-গণের রচনায় যেরূপ ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই এস্থলে ছাত্রগণের সম্মুখে ধারণ করা হইয়াছে। ধর্ম্ম ও সুনীতির দিকে ছাত্রগণের চিত্তাকর্ষণ করিবার ইহাই যে প্রকৃষ্টতম উপায়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

সীতার বনবাসের 'চিত্রদর্শন' অধ্যায় ও কাদম্বরী হইতে 'চন্দ্রা-পীড়ের শিক্ষা' প্রস্তাব গ্রহণ করিবার একটি গৌণ উদ্দেশ্যও আছে। তাহা এই,—প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণের সঙ্গে কৈশোরাবস্থায়ই ছাত্রগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় স্থাপন। ঐরূপে রজনীকান্তের রচনা হইতে 'হিউএনথ্ সঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত' প্রবন্ধ ও দীনেশচন্দ্রের রচনা হইতে হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতির বাঙ্গালাচর্চ্চার কথা সঙ্কলন করিবার গৌণ উদ্দেশ্য—দেশের প্রাচীন ইতিহাসপাঠে ছাত্রগণের প্রবৃত্তি উৎপাদন।

'সঙ্কলয়িতার নিবেদন' ইতিমধ্যেই সুদীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য আর বেশি কথা না বলিয়া বিবৃতিসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুইটি কথা সংযোজনা করিয়াই নিবেদনের উপসংহার করিব। অর্থপুস্তকের প্রাচুর্য্যে যে ধীরে ধীরে ছাত্রগণের স্বাবলম্বন হ্রাস-প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা ইদানীং একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। অথচ এই শ্রেণীর গ্রন্থের পঠন-পাঠনের সাহায্যোপযোগী নানারূপ অভিধান ও ইতিহাস গ্রন্থাদি ছাত্র শিক্ষক কাহারও পক্ষে নিতান্ত সুলভ নহে। সেই জন্য J. W. les এর Longer English Poems ও অন্যান্য ইংরেজি সংগ্রহ-

গ্রন্থের অনুকরণে গ্রন্থশেষে গ্রন্থকারের জীবনী, প্রবন্ধের ভাষার মধ্যে যেখানে কোনও বিশেষত্ব পরিদৃষ্ট হইয়াছে তাহা, দুরূহ উপমাদির ব্যাখ্যা ও প্রবন্ধোক্ত পুস্তক বা ব্যক্তিগণের পরিচয় দিয়াছি। ঈষৎ একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই পরিদৃষ্ট হইবে যে, ইহাতে ছাত্রগণের স্বাবলম্বনের কিছুমাত্র হানি না হইয়া, অন্যান্য গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির উদ্রেক হইবারই সম্ভাবনা বেশি। বিবৃতির সংস্কৃত ও ইংরাজী অংশ ছাত্রগণের জন্য অভিপ্রেত নহে। ইংরাজী ও সংস্কৃতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকগণেরও যাহাতে এই গ্রন্থের অধ্যাপনাকালে কিঞ্চিৎ আনন্দানুভব হয় তদ্বিষয়েও যত্নবান্ হইয়াছি।

যাঁহাদের গ্রন্থ হইতে প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়াছি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। জীবিত গ্রন্থকারগণ ও মৃত গ্রন্থকারদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও উত্তরাধিকারিগণ এই পুস্তকের জন্য প্রবন্ধনির্ব্বাচনের অনুমতি দান করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইত্যয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু ইতি।

ঢাকা,
২৫শে বৈশাখ, ১৩১৮।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত-গুপ্ত।

সূচীপত্র।

আগরার তাজমহল।

সন্দর্ভ-চন্দ্রিকা।

৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

চিত্রদর্শন।

['চিত্রদর্শন'-বৃত্তান্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাকবি ভবভূতির "উত্তর রামচরিত"-নামক সংস্কৃত নাটকের প্রথম অঙ্ক অবলম্বন করিয়া রচনা করেন। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রণীত 'সীতার বনবাস'-নামক গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়। ইহাতে আদর্শচরিত্র রামচন্দ্রের জীবনের কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা ও তৎ-সঙ্গে রাম ও সীতা উভয়ের চরিত্রের মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

এই সন্দর্ভের ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল হইলেও সরস ও প্রাঞ্জল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক। তাঁহার পরে ঐ ভাষায় গদ্যরচনাপ্রণালীর আরও সংস্কার ও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলেও, ছাত্রগণের পক্ষে অদ্যাপি তাঁহার "সীতার বনবাসে"র ভাষা, মধুর অথচ গম্ভীর এবং সরল অথচ গ্রাম্যতাদোষহীন রচনার সর্ব্বোত্তম আদর্শ।]

এক দিবস, রামচন্দ্র জানকীসমীপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় প্রতীহারী আসিয়া বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিল, মহারাজ! মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে সংবাদ লইয়া অষ্টাবক্র মুনি আসিয়াছেন। রাম ও জানকী শ্রবণমাত্র অতিমাত্র

ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, তাঁহাকে ত্বরায় এই স্থানে আনয়ন কর। প্রতীহারী, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক, পুনর্ব্বার অষ্টাবক্র সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অষ্টাবক্র, "দীর্ঘায়ুরস্তু" বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাম ও জানকী প্রণাম করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের কুশল? তাঁহার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে? সীতাও জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আমার গুরুজন ও আর্য্যা শান্তা সকলে কুশলে আছেন? তাঁহারা আমাদিগকে স্মরণ করেন, না একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন?

অষ্টাবক্র, সকলের কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া, জানকীকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আপনারে কহিয়াছেন, ভগবতী বিশ্বম্ভরা দেবী তোমায় প্রসব করিয়াছেন; সাক্ষাৎ প্রজাপতি রাজা জনক তোমার পিতা; তুমি সর্ব্বপ্রধান রাজকুলের বধূ হইয়াছ; তোমার বিষয়ে আর কোনও প্রার্থয়িতব্য দেখিতেছি না; অহোরাত্র এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বীরপ্রসবিনী হও। পরে অষ্টাবক্র রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী, বৃদ্ধা মহিষীগণ ও কল্যাণী শান্তা ভূয়োভূয়ঃ কহিয়াছেন, সীতাদেবী যখন যে অভিলাষ করিবেন, যেন অবশ্যই তাহা সম্পাদিত হয়। বশিষ্ঠদেব আপনারে কহিয়াছেন, বৎস! জামাতৃযজ্ঞে রুদ্ধ হইয়া, আমাদিগকে কিছু দিন এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবেক; তুমি বালক, অল্পদিন মাত্র

রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ; প্রজারঞ্জনকার্য্যে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে; প্রজারঞ্জনসম্ভূত নির্ম্মল কীর্ত্তিই রঘুবংশীয়দিগের পরম ধন। রাম কহিলেন, আমি ভগবানের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম; তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সর্ব্বদাই আমার শিরোধার্য্য; আপনি তাঁহার চরণারবিন্দে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করিয়া কহিবেন, যদি প্রজালোকের সর্ব্বাঙ্গীন অনুরঞ্জনের জন্য আমায় স্নেহ, দয়া বা সুখভোগে বিসর্জ্জন দিতে হয়, অথবা প্রাণপ্রিয়া জানকীরে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কিছুমাত্র কাতর হইব না। অনন্তর, রামচন্দ্র সন্নিহিত পরিচারকের প্রতি অষ্টাবক্রকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। অষ্টাবক্র সমুচিত সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক বিদায় লইয়া বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলে, রাম ও জানকী পুনরায় কথোপকথন আরম্ভ করিতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ আসিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি এক চিত্রকরকে আপনকার চরিত্র চিত্রিত করিতে কহিয়াছিলাম, সে এই আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছে, অবলোকন করুন। রাম কহিলেন, বৎস! দেবী দুর্ম্মনায়মানা হইলে কিরূপে তাঁহার চিত্তবিনোদন সম্পাদন করিতে হয়, তাহা তুমিই বিলক্ষণ জান; তা জিজ্ঞাসা করি, এই চিত্রপটে কি পর্য্যন্ত চিত্রিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্যা জানকীর অগ্নিপরিশুদ্ধিকাণ্ড পর্য্যন্ত।

রাম শুনিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার সমক্ষে আর ও কথা মুখে আনিও না; ও কথা শুনিলে

অথবা মনে হইলে, আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই। কি আক্ষেপের বিষয়! যিনি জন্মপরিগ্রহ করাতে জগৎ পবিত্র হইয়াছে, তাঁহাকেও আবার অন্য পাবন দ্বারা পূত করিতে হইয়াছিল। হায়, লোকরঞ্জন কি দুরূহ ব্রত! সীতা কহিলেন, নাথ! সে সকল কথা মনে করিয়া আপনি অকারণে ক্ষুব্ধ হইতেছেন কেন? আপনি তৎকালে সদ্বিবেচনার কর্ম্মই করিয়াছিলেন; সেরূপ না করিলে চিরনির্ম্মল রঘুকুলে কলঙ্ক-স্পর্শ হইত, এবং আমারও অপবাদবিমোচন হইত না। সীতা-বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আর ও কথায় কাজ নাই; এস আলেখ্য দেখি।

সকলে আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতা কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আলেখ্যের উপরিভাগে ঐ সমস্ত কি চিত্রিত রহিয়াছে? রাম কহিলেন, প্রিয়ে! ও সকল সমন্ত্রক জৃম্ভক অস্ত্র। ব্রহ্মাদি প্রাচীন গুরুগণ, বেদরক্ষার নিমিত্ত, দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া, ঐ সকল তেজঃপুঞ্জ পরম অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। পরম কৃপালু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র সবিশেষ কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক, তাড়কা-নিধনকালে আমারে তৎ-সমুদয় প্রদান করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি! এ দিকে মিথিলাবৃত্তান্ত অবলোকন করুন। সীতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, তাই ত, ঠিক যেন আর্য্যপুত্র হরধনু উত্তোলন করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার বিস্ময়াপন্ন

হইয়া অনিমিষনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আ মরি মরি, কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে। আবার, এদিকে বিবাহকালীন সভা ; সেই সভায় তোমরা চারি ভাই, তৎকালোচিত বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া, কেমন শোভা পাইতেছ ! চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সেই প্রদেশে ও সেই সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছি ! শুনিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম কহিলেন, প্রিয়ে ! যথার্থ কহিয়াছ, যখন মহর্ষি শতানন্দ তোমার কমনীয় কোমল করপল্লব আমার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, যেন সেই সময় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চিত্রপটের স্থলান্তরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, লক্ষ্মণ কহিলেন, এই আর্য্যা, এই আর্য্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি ; কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ উর্ম্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে উর্ম্মিলার দিকে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস ! এদিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে ? লক্ষ্মণ কোনও উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, দেবি ! দেখুন দেখুন, হরশরাসনভঙ্গবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া, ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন, আমাদের অযোধ্যা-গমন-পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন ; আর এদিকে দেখুন, ভুবনবিজয়ী আর্য্য, তাহার দর্পসংহার করিবার নিমিত্ত, শরাসনে শরসন্ধান করিয়াছেন। রাম আত্মপ্রশংসাবাদশ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইতেন, এ জন্য কহিলেন, লক্ষ্মণ ! এই চিত্রে আর আর নানা দর্শনীয় সত্ত্বে, ঐ অংশ লইয়া আন্দোলন করিতেছ কেন ?

সীতা রামবাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, নাথ! এমন না হইলে, সংসারের লোকে একবাক্য হইয়া আপনার এত প্রশংসা করিবে কেন?

তৎপরেই অযোধ্যাপ্রবেশকালীন চিত্র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে, রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্‌গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, আমরা বিবাহ করিয়া আসিলে, কত উৎসবে দিনপাত হইয়াছিল; পিতৃদেবের কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ; মাতৃদেবীরা অভিনব বধূদিগকে পাইয়া কেমন আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন, সতত তাহাদের প্রতি কতই যত্ন, কতই বা মমতা প্রদর্শন করিতেন; রাজভবন নিরন্তর আহ্লাদময় ও উৎসবপূর্ণ। হায়! সে সকল কি আহ্লাদের ও উৎসবের দিনই গিয়াছে! লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এই মন্থরা। রাম, মন্থরার নামশ্রবণে অন্তঃকরণে বিরক্ত হইয়া কোনও উত্তর না দিয়া, অন্য দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, শৃঙ্গবের নগরে যে তাপসতরুতলে পরম বন্ধু নিষাদপতির সহিত সমাগম হইয়াছিল, উহা কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

সীতা দেখিয়া হর্ষপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, নাথ! এদিকে জটাবন্ধন ও বল্কলধারণ বৃত্তান্ত দেখুন। লক্ষ্মণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা বৃদ্ধ বয়সে পুত্রহস্তে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন; কিন্তু, আর্য্যকে বাল্যকালেই সেই কঠোর আরণ্যব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। অনন্তর তিনি রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! মহর্ষি ভরদ্বাজ আমাদিগকে চিত্রকূট যাইবার পথ দেখাইয়া

দিয়া. যাহার কথা কহিয়াছিলেন, এই সেই কালিন্দী-তটবর্ত্তী বটবৃক্ষ। তখন সীতা কহিলেন, কেমন নাথ! এই প্রদেশের কথা স্মরণ হয়? রাম কহিলেন, প্রিয়ে! কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? এই স্থলে তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত ও কাতর হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে মস্তক দিয়া নিদ্রা গিয়াছিলে।

সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইলে আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধারণ করিয়া আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরি-তরঙ্গিনীতীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখ-সেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম; লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফলমূলাদি আহরণ করিতেন; গোদাবরীতীরে মৃদুমন্দগমনে

ভ্রমণ করিয়া, আমরা প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে শীতল সুগন্ধ সমীরণ সেবা করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও, কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, আর্য্যে! এই পঞ্চবটী, এই শূর্পণখা। মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথার্থই পূর্ব্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, এই ভাবিয়া, ম্লানবদনে কহিলেন, হা নাথ! এই পর্য্যন্তই দেখা শুনা শেষ হইল। রাম হাস্যমুখে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, অয়ি বিয়োগ-কাতরে! এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! চিত্রদর্শনে জনস্থানবৃত্তান্ত বর্ত্তমানবৎ বোধ হইতেছে। দুরাচার নিশাচরেরা হিরণ্ময় মৃগের ছলে যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল, যদিও সম্পূর্ণ বৈর-নির্য্যাতন দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে মর্ম্মবেদনা প্রদান করে। সেই ঘটনার পর, আর্য্য মানবসমাগমশূন্য জনস্থানভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকন করিলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সীতা লক্ষ্মণ-মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! এ অভাগিনীর জন্য আর্য্যপুত্রকে কতই ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে রামেরও নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! চিত্র দেখিয়া আপনি এত অভিভূত

হইলেন কেন? রাম কহিলেন, বৎস তৎকালে আমার যে বিষম অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদি বৈরনির্য্যাতনসঙ্কল্প অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক না থাকিত, তাহা হইলে আমি কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। চিত্রদর্শনে সেই অবস্থার স্মরণ হওয়াতে বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থিসকল শিথিল হইয়া গেল। তুমি সকলই স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছ, তবে এখন অনভিজ্ঞের মত কথা কহিতেছ কেন?

লক্ষ্মণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন, এবং বিষয়ান্তর সংঘটন দ্বারা রামের চিত্তবৃত্তির ভাবান্তর সম্পাদন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এদিকে দণ্ডকারণ্য ভূভাগ অবলোকন করুন। এই এদিকে পম্পা সরোবর। রাম পম্পাশব্দশ্রবণে সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর; আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম প্রফুল্ল কমলসকল মন্দমারুতভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া, সরোবরের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে; উহাদের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া, গুন্ গুন্ স্বরে গান করিয়া, উড়িয়া বেড়াইতেছে; হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ বারি-বিহঙ্গগণ মনের আনন্দে নির্ম্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে আমার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল; সুতরাং সরোবরের শোভা সম্যক্ অবলোকন করিতে পারি নাই; এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে মুহূর্ত্ত মাত্র নয়নের যে

অবকাশ পাইয়াছিলাম তাহাতেই কেবল একবার অস্পষ্ট অবলোকন করি।

সীতা, চিত্রপটের এক অংশে দৃষ্টি সংযোগ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ঐ যে পর্ব্বতে কুসুমিত কদম্ব-তরুর শাখায় মদমত্ত ময়ূর ময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণ কলেবর আর্য্যপুত্র তরুতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি রোদন করিতে করিতে উহাকে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি? লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্যে! ঐ পর্ব্বতের নাম মাল্যবান্, মাল্যবান্ বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান; দেখুন নবজলধরসংযোগে শিখরদেশের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে আর্য্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়া পূর্ব্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম, একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া কহিলেন, বৎস! বিরত হও, বিরত হও, আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না। শুনিয়া আমার শোক-সাগর অনিবার্য্য বেগে উথলিয়া উঠিতেছে; জানকীর বিরহ পুনর্ব্বার নবীভাব অবলম্বন করিতেছে। এই সময়ে সীতার আলস্য-লক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই, আর্য্যা জানকীর ক্লান্তিবোধ হইয়াছে; এক্ষণে উঁহার বিশ্রামসুখসেবা আবশ্যক; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।

৺ অক্ষয়কুমার দত্ত।

মেঘ ও বৃষ্টি।

[অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর উভয়ে সমসাময়িক লোক ছিলেন, এবং অপোগণ্ড বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন-বিষয়ে উভয়ের কৃতিত্ব প্রায় সমান। অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বঙ্গসাহিত্যসেবা আরম্ভ করেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যেই তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। যদিও বিদ্যাসাগরের রচনার সরসতা ও কোমল সৌন্দর্য্য অক্ষয় কুমারের ভাষায় দেখা যায় না, তথাপি বক্তব্য বিষয় তিনি যেরূপ সহজে ও ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন তদানীন্তন অন্য কোনও লেখক সেরূপ পারেন নাই। তাঁহার রচনার এই দুইটীই প্রধান ও উল্লেখ-যোগ্য গুণ। নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধে ভাষার প্রাঞ্জলতা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা তৃতীয় ভাগ "চারুপাঠ" হইতে সঙ্কলিত হইল।

জল উত্তপ্ত হইলে যে ধূমাকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প কহে। শীত ঋতুর প্রাতঃকালে নদী, সরোবর প্রভৃতি হইতে যে ধূমাকার বস্তু উঠিতে দেখা যায়, তাহাও ঐ বাষ্প বৈ আর কিছুই নয়। ঐ সকল বাষ্প ঘন হইলেই মেঘ হয়। মেঘ সচরাচর দুই ক্রোশের অধিক উঠিতে পারে না। এমন কি অনেক মেঘ দেড় ক্রোশ পর্য্যন্তও উত্থিত হয় না। বৃষ্টির সময়ে কতখান মেঘ কেবল অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র ঊর্দ্ধে থাকিয়া জল বর্ষণ করে, এই নিমিত্ত উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলে অধোদিকে মেঘের চলাচল দেখিতে পাওয়া যায়। চারি পাঁচ ক্রোশ উপরের বায়ু অতি স্বচ্ছ ও পরিশুষ্ক। তথায় মেঘ ও বাষ্পের লেশ মাত্রও নাই।

মেঘের উৎপত্তি, বায়ুর শৈত্য ও উষ্ণত্বের উপর বিস্তর নির্ভর করে। জল যত উত্তপ্ত হয়, তাহা হইতে ততই বাষ্প উঠিতে থাকে। এ নিমিত্ত প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে অধিক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া অধিক দূর উত্থিত হয়। সেই সমস্ত বাষ্প উপরিস্থিত বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে; অত্যন্ত লঘু বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ সমূহ বাষ্পরাশি আকাশমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, এমত সময়ে যদি কোন দিক্ হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে, ঐ সকল বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ জন্মায়। এইরূপ অন্য অন্য কারণেও বায়ুর উষ্ণতাহ্রাস ও শৈত্যবৃদ্ধি হইয়া মেঘ উৎপাদন করে। দিবাবসানকালে বায়ুর উত্তাপ ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে; এই নিমিত্ত সে সময়ে সতত মেঘ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। উপরিস্থিত বায়ু অধঃস্থিত বায়ু অপেক্ষা শীতল; এই হেতু যে সমস্ত জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময়ে অদৃশ্য থাকে, তাহা উপরে উঠিয়া ঘন হইয়া মেঘ জন্মায়।

উপরে প্রতিক্ষণ নানাদিকে নানাপ্রকার বায়ু-প্রবাহ বহিতে থাকে এবং সেইসঙ্গে মেঘ সমুদয় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া অশেষবিধ অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এক নিমিষের নিমিত্তেও স্থির নহে, সর্ব্বদাই তাহাদের কোন না কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। অদৃশ্য জলীয় বাষ্পের সহিত শীতল বায়ু মিশ্রিত হইলে, যেমন সেই বাষ্প ঘন হইয়া মেঘ উৎপাদন করে, সেইরূপ আবার উৎপাদিত মেঘে উষ্ণ বায়ু লাগিলে সেই মেঘ

বিক্ষিপ্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এক এক খান মেঘ উঠিতে উঠিতে যে অন্তর্হিত হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই।

সমুদায় মেঘই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণাসমূহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া অশেষ-প্রকার মনোহর বর্ণ উৎপাদন করে। সূর্য্যকিরণে নীল, পীত, লোহিত, হরিৎ, পাটল প্রভৃতি নানা বর্ণ আছে। বহুকোণ-বিশিষ্ট কাচে ও অন্য অন্য কোন কোন বস্তুতে সূর্য্যকিরণ পাতিত করিয়া ঐ সকল বর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখান যায়। বেলোয়ারি ঝাড়ের কলমে রৌদ্রের আভা পতিত হইয়া যে নানাবিধ বর্ণ উৎপাদন করে, তাহা অপর সাধারণ সকলেই বিদিত আছে। গগনমণ্ডলস্থ মেঘাবলির বিচিত্রবর্ণও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে; সচরাচর এই কয়েক বর্ণের মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়; শ্বেত, পীত, লোহিত, পিঙ্গল ও ধূসর। হরিদ্বর্ণ মেঘও পরম সুদৃশ্য; কিন্তু অতি বিরল। সায়ংকালীন জলদ-জালের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া কে না মোহিত হয়?

রামধনুর পরম সুন্দর শোভাও ঐরূপে সমুদ্ভূত হয়। উল্লিখিত বহুকোণ কাচের ন্যায়, বৃষ্টিকালীন জলকণাসমূহে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলেও তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন কিরণজাল সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উহার এক একটি জলকণা এক এক খানি বহুকোণ কাচস্বরূপ। এইরূপ বহুসংখ্যক জলবিন্দু একত্র হইয়া রামধনু উৎপাদন করে। নভোমণ্ডলের যে ভাগে সূর্য্যমণ্ডল অবস্থিত থাকে, তাহার বিপরীত ভাগে রামধনু দৃষ্ট হয়। লোক উহাকে রামধনু

ও ইন্দ্রধনু উভয়ই বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক উহা কাহারও ধনু নয়। জলকণাসমূহে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া এইরূপ মনোহর আকার উৎপন্ন হয়। সূর্য্যকিরণের ন্যায় চন্দ্রকিরণেও রামধনু উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু চান্দ্র রামধনুর বর্ণ সৌর রামধনুর তুল্যরূপ উজ্জ্বল নয়। যিনি এই অত্যাশ্চর্য্য অচিন্ত্য বিশ্বকার্য্যের সর্ব্বস্থানে সুললিত সৌন্দর্য্য-সুধা বর্ষণ করিতেছেন, উহাতে কেবল তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ পাইতেছে।

মেঘ কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা ব্যতিরেকে যে আর কিছুই নয়, ইহা পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন বাষ্প শীতল হইয়া মেঘ জন্মায়, সেইরূপ মেঘ শীতল হইলে তাহার অণু সমুদয় ঘন হইয়া জল হইয়া পড়ে। যে মেঘের ভার যে স্থানের বায়ুর ভারের সমান, সেই মেঘ সেইস্থানে অবস্থিত থাকে। পরে কোনও হেতু বশতঃ শীতল হইলেই, ঘনীভূত ও ভারাক্রান্ত হইয়া জলধারারূপে পৃথিবীতে পতিত হয়; ইহাকেই বৃষ্টি কহে। অতএব বৃষ্টির নিয়ম অতি সহজ। ইহা জানিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।

সমুদ্র ও জলাভূমি হইতে অধিক বাষ্প উত্থিত হয়। এই নিমিত্ত সেই সেই স্থানে ও তাহার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। পর্ব্বত-শিখর অপেক্ষাকৃত শীতল; অতএব যে সকল মেঘ চলিতে চলিতে পর্ব্বত শিখরে গিয়া অবস্থিত হয়, তাহা শীতে ঘনীভূত হইয়া জল হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত পর্ব্বতেও অধিক পরিমাণে জলবর্ষণ হইয়া থাকে। যে পর্ব্বত সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্ষণ হয় এবং

যে পর্ব্বত সমুদ্র তট হইতে দূরবর্ত্তী, তাহাতে তদপেক্ষা অল্পতর বৃষ্টিপাত হয়।

বায়ুপ্রবাহের ইতরবিশেষ দ্বারা বৃষ্টিপাতেরও অনেক ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে সমুদ্র, এ নিমিত্ত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ প্রভৃতি যে কয়েক মাস দক্ষিণ দিক্ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, সেই সেই মাসে উল্লিখিত সমুদ্র হইতে উৎপন্ন মেঘ সমুদায় ঐ বায়ু সহকারে সঞ্চালিত হইয়া ভারতভূমির উপর প্রচুর বারি বর্ষণ করে। এই প্রবল বায়ু কয়েক মাস প্রবাহিত থাকাতে ভারতবর্ষের বর্ষাকাল, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্মাদি ঋতুর ন্যায়, এক স্বতন্ত্র ঋতু বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। ইংলণ্ডে ও তাদৃশ অন্যান্য প্রদেশে এরূপ স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতু নির্দ্দিষ্ট নাই; সে সকল স্থানে বার মাসই বৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের উত্তর দিকে মেঘোৎপত্তির উপায় নাই। এ নিমিত্ত এতদ্দেশে কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণ বায়ু নিবৃত্ত হইয়া উত্তরীয় বায়ু আরব্ধ হইলে, জল-বর্ষণও এক প্রকার নিবৃত্ত হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অর্থাৎ দক্ষিণাপথের পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ তিন দিকেই সমুদ্র। এ নিমিত্ত যে সময়ে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন দক্ষিণাপথের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে, অর্থাৎ মলয়বরদেশে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়, এবং যখন পূর্ব্বোত্তর হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে অর্থাৎ চোলমণ্ডল নামক উপকূলে আসিয়া মেঘ ও বৃষ্টি উপস্থিতকরে।

পর্ব্বতাদি দ্বারা বায়ুর প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হওয়াতেও বৃষ্টিপাতে অনেক ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। যে বায়ু-প্রবাহ দ্বারা বাষ্পবারি আনীত হইয়া ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর খণ্ডে মেঘ সঞ্চারিত ও বারি বর্ষিত হয় তাহা প্রথমতঃ পশ্চিম-দক্ষিণ হইতে বঙ্গীয় অখাতের উপর দিয়া বাহিত হয়। পরে যখন হিমালয় ও তৎসন্নিহিত দক্ষিণদিকস্থ পর্ব্বতের নিকট উপনীত হইয়া তদ্দ্বারা প্রতিহত হয়, তখন আর উত্তরাংশে গমন করিতে না পারিয়া পশ্চিমোত্তর ভাগে চলিতে থাকে। পশ্চিমোত্তর ভাগে বহিতে বহিতে যখন হিন্দুকুষ নামক পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন তদ্দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই প্রকারে সুলিমান নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়া তদ্দ্বারা পুনরায় প্রতিহত হইয়া অন্য দিকে সঞ্চরণ করে।

যে সমস্ত মেঘ ও বায়ু উল্লিখিত বায়ুপ্রবাহ দ্বারা সঞ্চারিত হয়, তাহা হিমালয়ের উত্তরাংশে গমন করিতে পারে না; হিমালয়কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া বারিবর্ষণ পূর্ব্বক গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি অনেক অনেক নদীর জল বৃদ্ধি করে ও সেই সমস্ত নদীর তীরস্থ ভূমি জলে প্লাবিত করিয়া উর্ব্বরা করিয়া থাকে। ঐ বায়ু হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার উত্তরদিকে মেঘ ও বাষ্প সঞ্চালন করিতে পারে না। এ নিমিত্ত জলাভাবে সেই প্রদেশ মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে।

যদি কোন পর্ব্বতময় প্রদেশ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তাহা হইলে তত্রস্থ মেঘ সমুদায় সেই বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া

অন্য অন্য নিম্নস্থানে গিয়া বর্ষণ করে। যদি সেই সমস্ত স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়, তাহা হইলে, ঐ মেঘ ঘনীভূত না হইয়া আরও লঘু হইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে বৃষ্টি হয় না। এই কারণে ইয়ুরোপের দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী ভূমধ্যসাগর হইতে যে সমস্ত বাষ্পরাশি উৎপন্ন হইয়া মিশর দেশের উপর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, তাহা উল্লিখিত মিশর দেশের উপরে ঘনীভূত ও বর্ষিত না হইয়া উত্তরোত্তর দক্ষিণ দিকেই চলিয়া যায়। পরে যখন আবিসিনিয়ার পর্ব্বতময় উন্নত প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন জল হইয়া বর্ষিত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত মিশরদেশে সর্ব্বদাই অনাবৃষ্টি, গ্রীষ্মকালে মূলেই বৃষ্টি হয় না, অন্য সময়েও অতি অল্প। বিশেষতঃ তাহার দক্ষিণখণ্ডে জলবর্ষণ অতি অসামান্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত আছে। তত্রত্য লোক বৃষ্টি ব্যতিরেকে কিরূপে প্রাণধারণ করিয়া থাকে, বিবেচনা করিতে হইলে আপাততঃ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ করিয়া তাহাদের অনাবৃষ্টিঘটিত অনিষ্টপাতের আশঙ্কা একেবারে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন; তথায় যেমন যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় না, তেমন গ্রীষ্মকালে এরূপ শিশিরবর্ষণ হয় যে, তথাকার মৃত্তিকা তাহাতেই আর্দ্র হইয়া বিলক্ষণ উর্ব্বরা হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন, তথায় নীল নামে এক নদী আছে; তাহা গঙ্গা নদীর ন্যায় প্রতিবর্ষে বৃদ্ধি পাইয়া উভয় তট কয়েক মাস জলে প্লাবিত করিয়া রাখে। উহাতে ঐ উভয়তীরস্থ ভূমি অত্যন্ত-রস-শালিনী হইয়া অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী পেরু দেশে বালেস্ নামে এক স্থান আছে, তথায় দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তর দিকে বায়ু বহিয়া থাকে। সে স্থানের দক্ষিণ দিক্ শীতল এবং উত্তর দিক্ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শীতল প্রদেশ হইতে উষ্ণ প্রদেশে বাষ্প সঞ্চালিত হইলে বৃষ্টিপাত হয় না। এই নিমিত্ত ঐ বালেস্-ভূমিতে কোন কালেই বৃষ্টি হয় না। কিন্তু করুণার্ণব বিশ্ব-বিধাতার কি আশ্চর্য্য মহিমা! সেখানে যেমন কোন সময়ে বিন্দুপাতও হয় না, তেমন শীত-কালে এরূপ ঘোরতর কুজ্ঝটিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, তদ্দারা অত্যন্ত অনুর্ব্বরা ভূমিও উর্ব্বরা হয় এবং পথের ধূলিও কর্দ্দম হইয়া যায়।

আমাদের দেশে যেমন দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের বায়ুতে অধিক বৃষ্টি হয়, অন্য অন্য দেশেও ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশবিশেষে দিগ্বিশেষ হইতে বায়ু বহিলে যে বর্ষণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, ইহা তত্তদ্দেশীয় লোকের নিকট প্রসিদ্ধ আছে। ইংলণ্ড দেশে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিলে অধিক বৃষ্টি হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ দেশের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অতি বিস্তৃত সমুদ্র আছে, সেই সমুদ্রের কিয়দংশ অতি উষ্ণ, সুতরাং তথা হইতে প্রচুর বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, উষ্ণ বায়ুর সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক বাষ্প মিশ্রিত থাকিতে পারে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ দিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, ঐ বাষ্প সেই বায়ুসহকারে সঞ্চালিত হইয়া ইংলণ্ড,

স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি শীতল প্রদেশে নীত হইলে, ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি হইয়া পড়ে।

কোন্ প্রদেশে কত বৃষ্টি পতিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহা পরিমাণ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত বর্ষমাণ নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রতিবর্ষে কোন্ স্থানে কত জল পতিত হয়, ঐ যন্ত্র দ্বারা পরিমাণ করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। উহাতে যত বুরুল জল পতিত হয়, তত্তৎস্থানে বৃষ্টি তত বুরুল বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়।

উষ্ণ স্থানে অধিক বৃষ্টি পতিত হয়, শীতল স্থানে তদপেক্ষা অল্প। ইহার কারণ উষ্ণ স্থানে যত বাষ্প উৎপন্ন হয়, শীতল স্থানে কখনই তত হয় না। বাষ্প অধিক উৎপন্ন না হইলে বৃষ্টিও অধিক হইতে পারে না। ফলতঃ পৃথিবীর যে সকল প্রদেশ প্রখর রবি-কিরণে প্রতপ্ত, তথায় অধিক বারিবর্ষণ আবশ্যক করে, এই নিমিত্তই পরম কারুণিক পরমেশ্বর জলবর্ষণ-বিষয়ে ঐরূপ শুভকর ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।

জলবর্ষণের সহিত কখন কখন অন্য অন্য বস্তুও পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। এ বিষয় আপাততঃ আশ্চর্য্য বোধ হয় বটে, কিন্তু পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া সে আশ্চর্য্য দূরীকরণ করিয়াছেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী হঙ্গেরী দেশে রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ জল বর্ষিত হয়। প্রথমে ইহা অতিশয় বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল, পরে অবধারিত হইল, ঐ প্রদেশের অনতিদূরে এক অরণ্য আছে, তাহা হইতে পুষ্পরেণুসকল বায়ুসহকারে সঞ্চালিত

হইয়া বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় লোক যে রক্তবৃষ্টির কথা কহিয়া থাকে, তাহাও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকিবেক। একবার আয়র্লণ্ডে বৃক্ষনির্য্যাসের ন্যায় ঘনতর এক প্রকার দ্রবপদার্থ পতিত হয়। পরীক্ষা করিয়া নিরূপিত হইল, তাহাও উদ্ভিদ্ ও জন্তু বিশেষ হইতে নির্গত পদার্থবিশেষ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। চীনদেশে প্রতিবৎসর বালুকাবর্ষণ হইয়া থাকে। চীনদেশের উত্তরপার্শ্বে গবি নামে বহুবিস্তৃত বালুকাভূমি আছে এবং তথায় সর্ব্বদা ঘোরতর ঘূর্ণিবায়ুও উপস্থিত হইতে থাকে, অতএব বোধ হয় ঐ বালুকা ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা আকাশমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অনেক অনেক দূরবর্ত্তী প্রদেশে বর্ষিত হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বায়ুই এই সমুদায় অদ্ভুত বৃষ্টিপাতের প্রবল কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কত কত মৎস্য প্রবল বায়ু দ্বারা ৪।৫ ক্রোশ পরিচালিত হইয়া থাকে।

৵ তারাশঙ্কর তর্করত্ন

চন্দ্রাপীড়ের শিক্ষা।

[চন্দ্রাপীড় মহাকবি বাণভট্ট-প্রণীত 'কাদম্বরী' নামক সংস্কৃত আখ্যায়িকা বা উপন্যাস-গ্রন্থের নায়ক। পণ্ডিত-প্রবর ৵ তারাশঙ্কর তর্করত্ন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই উপন্যাস-গ্রন্থের গল্পাংশ বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ-পুস্তকের নামও 'কাদম্বরী'। বর্ত্তমান প্রবন্ধ এই শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইল। ইহাতে প্রাচীন কালে প্রচলিত অনেকগুলি রীতিনীতির আভাস পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রাপীড়ের পিতা তারাপীড়ের মন্ত্রী শুকনাসের জ্ঞানগর্ভ উপদেশগুলিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ইহার বিশুদ্ধ ভাষা ও রচনাভঙ্গিও ছাত্রগণের অনুকরণযোগ্য। বিদ্যাসাগরের ভাষার তুলনায় তারাশঙ্করের ভাষা সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ আড়ম্বরপূর্ণ হইলেও, এই প্রবন্ধে অনাবশ্যক আড়ম্বর বেশি নাই।]

নরপতির পুত্র হইয়াছে শুনিয়া নগরবাসী লোকের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। রাজবাটী মহোৎসবময়, নগর আনন্দময় ও পথ কোলাহলময় হইল। গৃহে গৃহে নৃত্য, গীত, বাদ্য আরম্ভ হইল। নরপতি সানন্দচিত্তে দীন, দুঃখী, অনাথ প্রভৃতিকে অর্থদান করিতে লাগিলেন। যে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিল তাহাকে তাহাই দিলেন। কারারুদ্ধকে মুক্ত ও ধনহীনকে ঐশ্বর্য্যশালী করিলেন।

গণকেরা গণনা দ্বারা শুভলগ্ন স্থির করিয়া দিলে নরপতি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীর সহিত গৃহে গমন

করিলেন। দেখিলেন সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে দুই পার্শ্বে সলিলপূর্ণ দুই মঙ্গলকলস, স্তম্ভের উপরিভাগে বিচিত্র কুসুমে গ্রথিত মঙ্গলমালা। পুরন্ধ্রীবর্গ কেহ বা ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিতেছে কেহ বা মাতৃকাগণের বিচিত্র মূর্ত্তি চিত্রপটে লিখিতেছে। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সূতিকাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রাজকুমার মহিষীর অঙ্কে শয়ন করিয়া সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। দেহপ্রভায় দীপপ্রভা তিরোহিত হইয়াছে। এরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য যে, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন, সাক্ষাৎ কুমার রাজকুমাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাজা নিমেষশূন্যলোচনে বারংবার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইল না। যতবার দেখেন অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অভিনব বোধ হয়। সস্পৃহ ও প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রদ্বারা পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া নব নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং আপনাকে চরিতার্থ ও পরম সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলেন। শুকনাস সতর্কতাপূর্ব্বক বিস্ময়-বিকসিত নয়নে রাজকুমারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! দেখুন কুমারের অঙ্গে চক্রবর্ত্তী ভূপতির লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে। করতলে শঙ্খচক্র রেখা, চরণতলে পতাকা রেখা, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ লোচন, উন্নত নাসিকা, লোহিত অধর, এই সকল চিহ্ন দ্বারা মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

দশম দিবসে পবিত্র মুহূর্ত্তে কোটি কোটি গাভী ও সুবর্ণ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া ও দীনদুঃখীকে অনেক ধন দিয়া নরপতি

পুত্রের নামকরণ করিলেন। স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্র রাজ্ঞীর মুখমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছে; সেই নিমিত্ত পুত্রের নাম চন্দ্রাপীড় রাখিলেন। ক্রমে চূড়াকরণ প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার সম্পন্ন হইল।

কুমারের ক্রীড়ায় কালক্ষেপ না হয় এই নিমিত্ত রাজা নগরের প্রান্তে শিপ্রানদীর তীরে এক বিদ্যামন্দির প্রস্তুত করাইলেন। বিদ্যামন্দিরের এক পার্শ্বে অশ্বশালা ও নিম্নে ব্যায়ামশালা প্রস্তুত হইল। চতুর্দ্দিক্ উন্নত প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত হইল। অশেষবিদ্যাপারদর্শী মহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ অতি-যত্নে আনীত ও শিক্ষাপ্রদানে নিয়োজিত হইলেন। নরপতি শুভদিনে চন্দ্রাপীড়কে তাঁহাদিগের নিকট সমর্পণ করিলেন। প্রতিদিন মহিষীর সহিত স্বয়ং বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। রাজকুমার এরূপ বুদ্ধিমান্ ও চতুর ছিলেন যে, অধ্যাপকগণ তাঁহার নব নব বুদ্ধিকৌশল দর্শনে চমৎকৃত ও উৎসাহিত হইয়া সমধিক পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনিও অনন্যমনা ও ক্রীড়াশক্তি-রহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার হৃদয়-দর্পণে সমুদায় কলা সংক্রান্ত হইল। অল্পকালের মধ্যেই শব্দশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, রাজনীতি, ব্যায়ামকৌশল, অস্ত্র ও সঙ্গীত বিদ্যা, সর্ব্বদেশভাষা এবং কাব্য, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি সমুদায় শিখিলেন। ব্যায়ামপ্রভাবে শরীর এমন বলিষ্ঠ হইল যে, করভ সকল সিংহ দ্বারা আক্রান্ত হইলে যেরূপ নড়িতে চড়িতে পারে না, সেইরূপ তিনি ধরিলেও এক পা চলিতে

পারিত না। ফলতঃ এরূপ পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী হইলেন যে, দশজন বলবান্ পুরুষ যে মুদ্গর তুলিতে পারে না, তিনি অবলীলাক্রমে সেই মুদ্গর ধারণপূর্ব্বক ব্যায়াম করিতেন।

এইরূপে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতে করিতে শৈশবকাল অতীত ও যৌবনকাল সমাগত হইল। চন্দ্রোদয়ে প্রদোষের যেরূপ রমণীয়তা হয়, গগনমণ্ডলে ইন্দ্রধনু উদিত হইলে বর্ষা-কালের যেরূপ শোভা হয়, কুসুমোদ্গমে কল্পপাদপের যেরূপ শ্রী হয়, যৌবনারম্ভে রাজকুমার সেইরূপ পরম রমণীয়তা ধারণ করিলেন। বক্ষঃস্থল বিশাল, উরুযুগল মাংসল, মধ্যভাগ ক্ষীণ, ভুজদ্বয় দীর্ঘ, স্কন্ধদেশ স্থূল, এবং স্বর গম্ভীর হইল।

উত্তম রূপে বিদ্যাশিক্ষা হইলে আচার্য্যেরা বিদ্যালয় হইতে গৃহে যাইবার অনুমতি দিলেন। তদনুসারে রাজা চন্দ্রাপীড়কে বাটীতে আনাইবার নিমিত্ত শুভদিনে অনেক তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পদাতিসৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া সেনাধ্যক্ষ বলাহককে বিদ্যা-মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। সমাগত অন্যান্য রাজগণও চন্দ্রা-পীড়ের দর্শনলালসায় বিদ্যালয়ে গমন করিলেন। বলাহক বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারকে প্রণাম করিল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, কুমার! মহারাজ কহিলেন, ‘আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। তুমি সমস্ত শাস্ত্র, সকল কলা, ও সমুদায় আয়ুধ বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ। এক্ষণে আচার্য্যেরা বাটী আসিতে অনুমতি দিয়াছেন। প্রজারা ও পরিজনেরা দেখিতে অতিশয় উৎসুক হইয়াছে। অতএব আমার অভিলাষ, তুমি অবিলম্বে বাটী আসিয়া দর্শনোৎসুক পরিজন-

দিগকে দর্শন দিয়া পরিতৃপ্ত কর, এবং ব্রাহ্মণদিগের সমাদর, মানিলোকের মানরক্ষা, সন্তানের ন্যায় প্রজাদিগের প্রতিপালন ও বন্ধুবর্গের আনন্দোৎপাদন পূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য-সম্ভোগ কর।' আপনার আরোহণের নিমিত্ত মহারাজ ত্রিভুবনের এক অমূল্য রত্ন স্বরূপ, বায়ু ও গরুড়ের ন্যায় অতি বেগগামী ইন্দ্রায়ুধনামা অপূর্ব্ব ঘোটক প্রেরণ করিয়াছেন। পারশ্য দেশের অধিপতি মহারত্ন ও আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া উহা মহারাজকে উপহার দেন।

বলাহক এই কথা কহিলে, চন্দ্রাপীড় গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন ইন্দ্রায়ুধকে এই স্থানে লইয়া আইস। আজ্ঞামাত্র অতি বৃহৎ স্থূলকায় মহাতেজস্বী, প্রচণ্ড বেগশালী, বলবান্ ইন্দ্রায়ুধ আনীত হইল। ঐ ঘোটক এরূপ বলিষ্ঠ ও তেজস্বী যে, দুই বীরপুরুষ উভয়পার্শ্বে মুখের বল্গা ধরিয়াও উন্নমনের সময় মুখ নিম্ন করিয়া রাখিতে পারে না। এরূপ উচ্চ যে, উন্নত পুরুষেরাও কর প্রসারিত করিয়া পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। চন্দ্রাপীড় সুলক্ষণসম্পন্ন অদ্ভুত অশ্ব অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন, অসুর ও দেবগণ সাগরমন্থন করিয়া কি রত্ন লাভ করিয়াছেন? পিতার কি আধিপত্য! ত্রিভুবনদুর্লভ এতাদৃশ রত্ন সকলও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার আকার ও লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে এ প্রকৃত ঘোটক নহে। কোন মহাত্মা শাপগ্রস্ত হইয়া অশ্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অশ্বের

নিকট উপস্থিত হইয়া মনে মনে নমস্কার ও আরোহণ জন্য অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ও বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইলেন।

চন্দ্রাপীড় ক্রমে ক্রমে নগরের মধ্যবর্ত্তী পথে সমাগত হইলেন। নগরবাসীরা সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজকুমারের সুকুমার আকার অবলোকন করিতে লাগিল। নগরস্থ সমস্ত বাটীর দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়াতে বোধ হইলে যেন নগরী চন্দ্রাপীড়কে দেখিবার নিমিত্ত একেবারে সহস্র সহস্র নেত্র উন্মীলন করিল। চন্দ্রাপীড় নগরে আসিতেছেন শুনিয়া রমণীগণ অতিশয় উৎসুকা হইল এবং আপন আপন আরব্ধ কর্ম্ম সমাপন না করিয়াই কেহ বা অলক্তক পরিতে পরিতে, কেহ বা কেশ বাঁধিতে বাঁধিতে, বাটীর বহির্গত হইয়া, কেহ বা প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া, এক দৃষ্টিতে পথপানে চাহিয়া রহিল। একেবারে সোপান-পরম্পরায় শত শত কামিনীজনের অসম্ভ্রমে পাদ-নিক্ষেপ করায় প্রাসাদমধ্যে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ভূষণশব্দ সমুৎপন্ন হইল। গবাক্ষজালের নিকটে কামিনীগণের মুখপরম্পরা বিকসিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। স্ত্রীগণের চরণ হইতে আর্দ্র অলক্তক পতিত হওয়াতে ক্ষিতিতল পল্লবময় বোধ হইল। তাহাদিগের অঙ্গশোভায় নগর লাবণ্যময়, অলঙ্কারপ্রভায় দিগ্বলয় ইন্দ্রায়ুধময়, মুখমণ্ডলে ও লোচনপরম্পরায় গগণমণ্ডল চন্দ্রময় ও পথ নীলোৎপলময় বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইলেন। বলাহক অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। রাজকুমার

বৈশম্পায়নের হস্তধারণপূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুর পুরন্ধ্রীরা রাজকুমারকে দেখিবা মাত্র আনন্দিত মনে মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। মহারাজ পরিষ্কৃতশয্যা-মণ্ডিত পর্য্যঙ্কে নিষণ্ণ আছেন; শরীররক্ষাধিকৃত অস্ত্রধারী দ্বারপালেরা সতর্কতা পূর্ব্বক প্রহরীর কার্য্য করিতেছে; এমন সময়ে চন্দ্রাপীড় পিতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। "মহারাজ! অবলোকন করুন" দ্বারপাল এই কথা কহিলে, রাজা দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক চন্দ্রাপীড়কে সমাগত দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। করপ্রসারণ-পূর্ব্বক প্রণত পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার স্নেহবিকসিত লোচন হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল তথায় বসিয়া রাজকুমার জননীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা বিলাসবতী স্নিগ্ধ ও প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে পুত্রকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ ও হস্ত দ্বারা গাত্র স্পর্শপূর্ব্বক আপন উৎসঙ্গদেশে বসাইলেন ও স্নেহসম্বলিত মধুর বচনে বলিলেন, বৎস, তোমাকে নানাবিদ্যায় বিভূষিত দেখিয়া নয়ন ও মন তৃপ্ত হইল। এক্ষণে বধূসহচারী দেখিলে সকল মনোরথ পূর্ণ হয়। এই কথা কহিয়া লজ্জাবনত পুত্রের কপোলদেশ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

কিছুদিনের পর রাজা চন্দ্রাপীড়কে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অভিলাষ করিলেন। রাজকুমার যুবরাজ হইবেন এই ঘোষণা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজবাটী মহোৎসবময় ও নগর আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। অভিষেকের সামগ্রী-সম্ভার সংগ্রহের নিমিত্ত লোকসকল দিগ্‌দিগন্তে গমন করিল।

একদা কার্য্যক্রমে চন্দ্রাপীড় অমাত্যের বাটীতে গিয়াছেন; তথায় শুকনাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, কুমার! তুমি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সমুদায় বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ, সকল কলা শিখিয়াছ, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা জ্ঞাতব্য সমুদায় জানিয়াছ। তোমার অজ্ঞাত ও উপদেষ্টব্য কিছুই নাই। তুমি যুবা, মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও ধনসম্পত্তির অধিকারী করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব তিনেরই অধিকারী হইলে। কিন্তু যৌবন অতি বিষম কাল। যৌবনরূপ বনে প্রবেশ করিলে বন্যজন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। যুবা পুরুষেরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশুধর্ম্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান করে। যৌবনপ্রভাবে মনে একপ্রকার তম উপস্থিত হয়; উহা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। যৌবনের আরম্ভে অতি নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিতা হয়। বিষয়তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়গণকে আক্রমণ করে। তখন অতি গর্হিত অসৎকর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থসম্পাদন করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। সুরাপান না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। ধনমদে মত্ত হইলে হিতাহিত বা সদসৎ বিবেচনা থাকে না। অহঙ্কার ধনের অনুগামী। অহঙ্কৃত পুরুষেরা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্, বিদ্বান্ ও প্রধান বলিয়া ভাবে, অন্যের নিকটেও সেইরূপ প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপন

মতের বিপরীত কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। প্রভুত্বরূপ হলাহলের ঔষধ নাই। প্রভুজনেরা অধীন লোকদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে। আপন সুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরের দুঃখ সন্তাপ কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা প্রায় স্বার্থপর ও অন্যের অনিষ্টকারক হইয়া উঠে। যৌবরাজ্য, যৌবনপ্রভুত্ব, ও অতুল ঐশ্বর্য্য, এ সকল কেবল অনর্থপরম্পরা। অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইহার তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিরূপ দৃঢ় নৌকা না থাকিলে উহার প্রবলপ্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইলে আর উঠিবার সামর্থ্য থাকে না।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয় এ কথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোনও ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসম্ভূত রত্ন। উহা শরীরের বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয় এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকট শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয়, সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে; অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন পারিষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদদিগের

নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয়, এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিয়া থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোনও সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেয় তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার, ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়।

প্রথমতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখ। ইনি অতি দুঃখে লব্ধ ও অতি যত্নে রক্ষিত হইলেও, কখনও এক স্থানে স্থির হইয়া থাকেন না। রূপ, গুণ, বৈদগ্ধ্য, কুল, শীল কিছুই বিবেচনা করেন না। যাহাকে আশ্রয় করেন সে স্বার্থনিষ্পাদনপর ও লুব্ধপ্রকৃতি হইয়া দ্যূতক্রীড়াকে বিনোদ, পশুধর্ম্মকে রসিকতা, যথেচ্ছাচারকে প্রভুত্ব ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। মিথ্যা স্তুতিবাদ করিতে না পারিলে ধনীদিগের নিকট জীবিকা লাভ করা কঠিন। যাহারা অন্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ ও কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য হয়, এবং সর্ব্বদা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধনেশ্বরকে 'জগদীশ্বর' বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারাই ধনিগণের সন্নিধানে বসিতে পারে ও প্রশংসাভাজন হয়। প্রভু স্তুতিবাদককে যথার্থবাদী বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার সহিতই আলাপ করেন, তাহাকেই সদ্বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ভাবেন, তাহার পরামর্শক্রমেই কার্য্য করিয়া থাকেন।

তুমি স্বভাবতঃ ধীর তথাপি তোমাকে বারংবার উপদেশ দিতেছি, সাবধান যেন ধন ও যৌবন-মদে উন্মত্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। এক্ষণে মহারাজের ইচ্ছাক্রমে অভিনব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভূভার বহন কর। অরাতিমণ্ডলের মস্তক অবনত কর, এবং সমুদায় দেশ জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে আপন আধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক প্রজাদিগের প্রতিপালন কর। এইরূপ উপদেশ দিয়া অমাত্য ক্ষান্ত হইলেন। চন্দ্রাপীড় শুকনাসের গভীর অর্থযুক্ত উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে উহারই আন্দোলন করিতে করিতে বাটী গমন করিলেন।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

[এই প্রবন্ধ মূল সংস্কৃত মহাভারতের ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত অনুবাদ হইতে সঙ্কলিত হইল। মহাভারতের অনুবাদ করিয়া কালী-প্রসন্ন বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ বিশুদ্ধ অথচ অতিশয় প্রাঞ্জল। নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে ছাত্রগণ তাঁহার অনুবাদের প্রাঞ্জলতা লক্ষ্য করিতে পারিবে।

পত্নী ও ভ্রাতৃগণ সহ যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ অভিলাষে হিমালয়াভিমুখে মহাপ্রস্থান করেন। পথিমধ্যেই ক্রমে ক্রমে তাঁহার পত্নী দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব দেহত্যাগ করেন। মহাপ্রস্থান-কালে একটি কুক্কুরও তাঁহার সাথী হয়, এই কুক্কুর ছদ্মবেশী ধর্ম্ম।]

ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মনন্দন এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র রথশব্দে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর।" তখন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের পতননিবন্ধন শোকাকুল হইয়া দেবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সুররাজ! সুখসংবর্দ্ধিতা সুকুমারী পাঞ্চালী ও আমার পরমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে। উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত উহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অনুজ্ঞা করুন।"

ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! দ্রৌপদী ও তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয় মানুষদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অগ্রেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি এই নরদেহেই স্বর্গারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।"

সুররাজ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে, ধর্ম্মরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবরাজ! এই কুক্কুর আমার একান্ত ভক্ত। এ বহুদিন আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে আমার সহিত স্বর্গারোহণ করিতে আদেশ করুন। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে।

ধর্ম্মনন্দন এইরূপ অনুরোধ করিলে দেবরাজ কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আজ তুমি অতুল সম্পদ, পরম সিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব লাভ করিবে। অতএব অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।"

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেবরাজ! অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্রলোকের কদাপি বিধেয় নহে। এক্ষণে যদি স্বর্গীয় সম্পত্তি লাভের জন্য আমাকে এই পরম-ভক্ত কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সম্পদে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।"

ইন্দ্র কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কুক্কুরের সহিত একত্র অবস্থান করে, সে কখনই স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হয় না। ক্রোধবশ-নামক দেবগণ তাহার যজ্ঞদানাদির ফল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। অতএব তুমি অবিলম্বে এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর। ইহাতে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেবেন্দ্র! ভক্তজনকে পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যা সদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব আমি আত্মসুখের নিমিত্ত কখনই এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিব না। ভীত, ভক্ত, অনন্যগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি।"

ইন্দ্র কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! কুক্কুর যজ্ঞ, দান ও হোম ক্রিয়া দর্শন করিলে, ক্রোধবশ-নামক দেবগণ ঐ সমুদয় কার্য্যের ফল ধ্বংস করিয়া থাকেন। কুক্কুর অতি অপবিত্র জন্তু; অতএব তুমি অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার অনায়াসে পরম-পবিত্র দেবলোকলাভ হইবে। যখন তুমি প্রাণাধিকা দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছ, তখন তোমার এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিবার বাধা কি? তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া এক্ষণে এরূপ বিমোহিত হইতেছ কেন?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেবরাজ ইহলোকে কাহারও মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, আমি

উহাদের জীবনদান করিতে সমর্থ নহি বিবেচনা করিয়াই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। উহারা জীবিত থাকিতে আমি উহাদিগকে ত্যাগ করি নাই। আমার মতে ভক্তজনকে পরিত্যাগ করা, শরণাগত ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মস্বাপহরণ, ও মিত্রদ্রোহ এই চারিটি কার্য্যের ন্যায় মহাপাপজনক।”

মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী সেই কুক্কুর সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়া প্রীতমনে মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কুক্কুরবেশে তোমার সহিত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল। পূর্ব্বে আমি দ্বৈতবনে একবার তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঐ সময় তোমার ভ্রাতৃগণ জল অন্বেষণার্থ গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি ভীম ও অর্জ্জুনের জীবন প্রার্থনা না করিয়া মাদ্রীকে স্মরণপূর্ব্বক নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলে; এবং এক্ষণেও কুক্কুরকে আশ্রিত বিবেচনা করিয়া দেবরথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমার এই দুই কার্য্যদর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ স্বর্গলোকে আর কেহই নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গারোহণপূর্ব্বক অক্ষয়লোক লাভ করিতে পারিবে।”

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিবা মাত্র ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ এবং অন্যান্য দেবতা ও দেবর্ষিসমুদয় তাঁহার সহিত

সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দিব্যরথে আরোপিত করিয়া আপনারা দিব্য বিমানসমুদয়ে সমারূঢ় হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ সেই দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক তেজোদ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। তিনি দেবলোকে উপস্থিত হইবা মাত্র লোকতত্ত্ববেত্তা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ দেবগণের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "যে সমুদয় রাজর্ষি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আজি মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় যশঃ ও তেজোদ্বারা তাঁহাদিগের সকলেরই কীর্ত্তি আচ্ছাদনপূর্ব্বক সশরীরে স্বর্গারূঢ় হইলেন। পূর্ব্বে আর কোন ব্যক্তিই সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।"

দেবর্ষি এই কথা কহিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির দেবগণ ও স্বপক্ষীয় পার্থিবগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহা-পুরুষগণ! আমার ভ্রাতৃগণ যে লোকে গমন করিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক, আমি সেই লোকেই গমন করিব। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই।" ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সরলভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিয়াছ; অতএব এই স্থানেই অবস্থান কর। কেন তুমি অদ্যাপি মনুষ্যবৎ স্নেহের বশীভূত হইতেছ? আর কেহই কখন তোমার তুল্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন নাই। তোমার ভ্রাতৃগণ এ স্থানের অধিকারী নহে। এই স্বর্গভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মানুষভাবে সমাক্রান্ত হওয়া তোমার নিতান্ত

অনুচিত। এই দেখ, মহর্ষি ও দেবগণ এইস্থানে অবস্থান করিতেছেন।”

দেবরাজ এই কথা কহিলে মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “সুররাজ! আমার প্রণয়িনী বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী ও আমার পরমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ যে স্থানে বাস করিতেছে, সেই স্থানেই গমন করিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।”

৺ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রোগীর সেবা।

[ভূদেবচন্দ্রের ভাষার বিশেষত্ব এই যে, উহা সরল, কোমল, অলঙ্কারহীন, অথচ বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। তাঁহার রচিত মৌলিক প্রবন্ধগুলির সর্ব্বত্রই এই গুণ অতিশয় পরিস্ফুটরূপ বিদ্যমান। বর্ত্তমান সন্দর্ভ তাহার 'পারিবারিক প্রবন্ধ'-নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

ভাষা ব্যতীত এই সন্দর্ভে শিক্ষণীয় বিষয় যথেষ্ট আছে। রোগীর সেবা আমাদের কেবল সমাজনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য নহে, উহা আমাদের চরিত্রগঠনের একটী প্রধান সহায় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিরও অন্যতর সোপান। এই প্রবন্ধে রোগীর সেবাবিষয়ে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানসম্মত অনেকগুলি উপদেশ আছে।]

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল না হয়, সে বাটী ভাল নয়। সে বাটীতে স্নেহ মমতা কম—স্বার্থপরতা বেশি—আত্মত্যাগশক্তি ন্যূন—বিলাসিতা অধিক। সে বাটীর স্ত্রী-পুরুষেরা সহজেই ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কখন কোন উন্নত জীবনের অধিকারী হইতে পারে না।

রোগীর সেবা পরিবারবর্গের যে কতদূর করা উচিত, আমি তাহার কোন বিশেষরূপ ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমাদের সম্মিলিত পরিবারের গুণবত্তা আমার চক্ষে অপরিসীম বলিয়াই বোধ হইয়াছে। ঐ সময়ে মিলিত পরিবার-বর্গের টাকা এক ও মন এক হইয়া যায়। এই স্থলে একটা কথা

বলিয়া রাখি। আস্তবলে যদি একটা ঘোড়া পীড়িত হইয়া পড়ে, তবে আস্তবলের সকল ঘোড়া পালাইয়া যাইবার চেষ্টা করে—গোশালায় একটা গোরু রুগ্‌ণ হইয়া পড়িলে আর যে গোরু তাহাকে দেখিতে পায়, সেই উব লেজ করিয়া দৌড়াইতে চায়—কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, ময়না, টিয়া, চটক প্রভৃতি সকল পশুপক্ষীরই এই ব্যবহার। প্রায় কেহই স্বজাতীয় পীড়িতের সমীপে গমন করিয়া তাহার গা ঝাড়িয়া বা চাটিয়া দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করে না। অতএব পীড়িতের শুশ্রূষা পাশবধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য। যে মনুষ্যজাতির মধ্যে পাশব ভাব অল্প, সেই জাতীয় ব্যক্তি পীড়িতের সেবায় তত অধিক যত্নশীল হইয়া থাকে।

যদি রোগীর সেবার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকে, তবে সে সীমা বাহির হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার নয়। সে সীমা, সেবার উদ্দেশ্য কি ইহাই বিচার করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সেবার উদ্দেশ্য পীড়িতকে রোগমুক্ত করা। রোগীর মনে ভয়-সঞ্চার হইলে রোগমুক্তির চেষ্টা বিফল হইতে পারে। এই জন্য এমন ভাবে সেবা করা আবশ্যক, যাহাতে রোগী মনে না করিতে পারে যে, তাহার জন্য পরিবার অতি ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি স্ত্রী, কি পুত্র, কি ভ্রাতা, রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া আছ,—তোমার আহার করিবার সময় হইল, আর যে ব্যক্তি তোমার স্থান গ্রহণ করিবে সে রোগীর ঘরে আসিল—তোমাকে খাইতে যাইবার অবসর দিল—তুমি যাইতে চাহ না। ইহাতে রোগী কি ভাবিবে? তুমি তাহার পীড়ার আতিশয্যে

ভীত হইয়াছ ইহাই বুঝিবে না কি ? এবং তাহা বুঝিলে স্বয়ং ভীত হইবে না কি ? অতএব ওরূপ করিও না। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আহার করিতে যাও। আর তুমি মা, শিশু পীড়িত হইয়া তোমার ক্রোড়ে শয়িত—তুমি রাত্রি দিন তাহার মলিন মুখমণ্ডলের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছ ; খাইতে যাও না, শুইতে যাও না, একেবারে শরীরপাত করিতেছ ; যদি শিশু তোমার দুধ খায়—তবে তোমার শোকবিহ্বলহৃদয়-শোণিত দূষিত হইতেছে—তোমার দুগ্ধ, যাহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা সুপথ্য তাহা বিষবৎ হইয়া উঠিতেছে ; তুমি অধীরা হইয়া শিশুর ত কোন উপকারই করিতে পারিতেছ না, উহাকে দূষিত স্তন্যরূপ বিষ পান করাইয়া তাহার সাক্ষাৎ বধভাগিনী হইতেছ। মনে কর, উটি যেন কচি নয়—তোমার ক্রন্দনের হা-হতাশের, উপবাসের এবং অনিদ্রার, প্রকৃত হেতুই বুঝিতে সমর্থ। তাহা হইলে ত ও বড়ই ভীত হইত। কিন্তু যাহাতে রোগী ভীত হইতে পারে এমন কাজ করিতে নাই। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আপনার শরীরকে সুস্থ রাখ, শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্যটি নষ্ট করিও না। এই জন্যই প্রাচীনা গৃহিণীরা বলিতেন, পীড়িত ছেলেকে কোলে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে নাই।

তবে কি রোগীর নিকট হাস্য—কৌতুক—বিদ্রূপাদি করিয়া দেখাইব যে, আমি তাহার পীড়ায় কিছুই ভীত হই নাই ? বরং এ পক্ষ অবলম্বন করা ভাল, তথাপি অধীর এবং ভয়বিহ্বল হওয়া ভাল নয়। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম ব্যবহারেরও অনেক দোষ আছে। যাহা কৃত্রিম এবং মিথ্যা তাহার সমগ্র ফল কখনই

উত্তম হইতে পারে না। রোগী ঐ কৃত্রিমতার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরক্ত হইবে—অথবা যদি প্রবেশ করিতে না পারে, তোমাকে নির্ম্মায় এবং হৃদয়শূন্য মনে করিবে—অথবা স্বয়ং হাস্যপরিহাসে যোগ দিতে গিয়া নিজের নাড়ী চঞ্চল এবং স্নায়ুমণ্ডল বিলোড়িত করিয়া তুলিবে। অতএব ওরূপ কৃত্রিমতাও দূষ্য।

রোগীর সেবক সর্ব্বদা রোগীর প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিবেন—তাহার কি কষ্ট হইতেছে, তাহা বিনা কথনে এবং বিনা ইঙ্গিতেও বুঝিবেন, এবং সেই কষ্ট নিবারণ বা উপশমের যে উপায় আছে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করিবেন। কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখাইবেন না—স্বয়ং ধীর শান্তমূর্ত্তি হইয়া পীড়িতরূপ দেবতার পূজা করিতে থাকিবেন।

পীড়িতের সেবকে আর দেবতার সাধকে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সাধককে স্থিরাসন হইয়া থাকিতে হয়। চুল্‌বুলে লোকেরা, যাহারা সর্ব্বদাই এপাশ ওপাশ হইয়া বসিতে থাকে, এক ভাবে স্থির থাকিতে পারে না, তাহারা ভাল সেবক হয় না। সাধককে নিশ্চলদৃষ্টি হইতে হয়। তাহার হৃদয়ে ধ্যানগম্য ইষ্টমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে। সেবককেও পীড়িতের পূর্ব্বমূর্ত্তি এবং পূর্ব্বভাব দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিতে হয়। তাহা হইলেই ব্যাধিজনিত লক্ষণবিপর্য্যয় তাঁহার লক্ষ্যমধ্যে আইসে। সাধকের পক্ষে তন্মনস্ক হওয়া অত্যাবশ্যক। সেবককেও পীড়িতের প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিতে হয়। তাহা না থাকিলে তিনি উহার কোন্ সময়ে কি প্রয়োজন হইতেছে তাহা বুঝিতে

পারেন না—রোগীকে কথা কহিয়া অথবা ইঙ্গিত করিয়া আত্ম-প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে হয়, এবং রুগ্‌ণ ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারেও না এবং চাহেও না; যদি করিতে হয় বড়ই বিরক্ত এবং দুঃখিত হয়। যে সেবক বা সেবিকাতে সাধকের এই সকল গুণ বিদ্যমান, তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেই রোগীর প্রফুল্লতা জন্মে। তিনি আসিয়াই যেন জানিতে পারেন—একটু জল চাই—কি দুই চারিটা দাড়িম্বের দানা চাই—গায়ের চাদরটা একটু পায়ের দিকে টানিয়া দিতে হইবে—বালিসটা একটু উচ্চ করিয়া দিতে হইবে, ফুলগুলি সরাইয়া একটু দূরে বা নিকটে রাখিতে হইবে—শীতল হস্তটি কপালে দিতে হইবে—ঠিক একটু চাপিয়া বা আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আস্তে আস্তে নিজে ঐ কাজগুলি করিতে থাকেন, পীড়িতের বদনমণ্ডলে মৃদু হাস্যের আভা দেখা দেয়—সেবক কৃতার্থ হয়েন।

পরিজনগণ উল্লিখিত ভাবে রোগীর সেবা করিবে। গৃহ-স্বামী সকলকে সতর্ক করিয়া দিবেন, যেন পীড়িতের বিছানা, বালিস, বস্ত্রাদি বাটীর অপর কাহার বস্ত্রাদির সহিত না মিশে—তাহার মল, মূত্র, ক্লেদাদি বাটী হইতে অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কৃত হয়—তাহার ব্যবহৃত পাত্রাদি বাটীর সাধারণ পাত্রাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকে—এবং সেবকেরা যতদূর পারেন, যে কাপড়ে রোগীর ঘরে থাকেন, সে কাপড় না ছাড়িয়া বাটীর অপর লোকের বিশেষতঃ বালক বালিকাদিগের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে না আইসেন। গৃহস্বামী পীড়ার প্রকৃতি বিবেচনা

করিয়া এই সকল আদেশ দিবেন এবং সমস্ত পরিজন সেই আদেশ পালন করিবে। গৃহস্বামীর আদেশ যে পরিজনেরা পালন করিবে, সে কথা দৃঢ়রূপে বলিবার প্রয়োজন এই যে, স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ পীড়িত ছেলের মায়েরা এই বিষয়ে একটু ভ্রমান্ধ!

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(১)—স্বপ্ন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যে এক নব যুগের প্রবর্ত্তক। বর্ত্তমান সময়ে আমরা বাঙ্গালাগদ্যে যে বৈচিত্র্য, পূর্ণতা ও সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ দেখিতে পাই, ইহা অনেকাংশে তাঁহারই প্রতিভার ফল। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গদ্য-লেখকগণকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে; একদল নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতশব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী; এই শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে যাঁহাদের বিদ্যাসাগর বা তারাশঙ্করের প্রতিভা ছিল না, তাঁহাদের রচনা প্রায়ই অতিশয় নীরস, শ্রুতি-কঠোর, এবং বাঙ্গালাভাষার স্বাভাবিকলালিত্যহীন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগণ ঘোরতর সংস্কৃতদ্বেষী ও কথিত ভাষায় গ্রন্থরচনার পক্ষপাতী ছিলেন। ইঁহাদের রচনাপ্রণালী যদিও খুব সরল, তথাপি তাহা অনেক স্থলে গ্রাম্যতা ও চপলতা দোষে দুষ্ট এবং গম্ভীর রচনার অনুপযোগী। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা গদ্যকে এই উভয়শ্রেণীর দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া তাহাকে এক অভিনব পথে প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার রচনায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত-বাঙ্গালা এই উভয় ভাষার অতি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্যে নানা রসের সঞ্চার ও বাঙ্গালা রচনায় নানা ভঙ্গীর অবতারণায় তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ।

এই সমস্ত কারণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা গদ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া সাহিত্যিকসমাজে স্বীকৃত ও পূজিত হইয়াছেন।

এই সন্দর্ভ তাঁহার "বিষবৃক্ষ"-নামক উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদের বিষয়। কুন্দনন্দিনী আশৈশব মাতৃহীনা। সংসারে এক বৃদ্ধ পিতা ব্যতীত তাহার আর কোনও আত্মীয় বা পরিজন ছিল না। এক ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন রজনীতে তাহার পিতাও তাহাকে নিঃসহায় রাখিয়া

দেহত্যাগ করেন। উপন্যাসকার এই স্থানে এক মনোরম কবিসময়-প্রসিদ্ধি প্রথার অনুসরণ করিয়া স্বপ্নচ্ছলে কুন্দনন্দিনীর দুঃখময় ভাবি-জীবনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভাস দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ও এই পরিচ্ছেদের নামকরণ করিয়াছেন "ছায়া পূর্ব্বগামিনী।"]

নিশীথ সময়। ভগ্ন-গৃহমধ্যে কুন্দনন্দিনী ও তাহার পিতার শব। কুন্দ ডাকিল, "বাবা!" কেহ উত্তর দিল না। কুন্দ একবার মনে করিল, পিতা ঘুমাইলেন, আবার মনে করিল, বুঝি মৃত্যু—কুন্দ সে কথা স্পষ্ট মুখে আনিতে পারিল না। শেষে, কুন্দ আর ডাকিতেও পারিল না, ভাবিতেও পারিল না; অন্ধকারে ব্যজনহস্তে যেখানে তাহার পিতা জীবিতাবস্থায় শয়ান ছিলেন, এক্ষণে যেখানে তাঁহার শব পড়িয়াছিল, সেই খানে বায়ুসঞ্চালন করিতে লাগিল। নিদ্রাই শেষে স্থির করিল, কেন না, মরিলে কুন্দের দশা কি হইবে? দিবারাত্রি জাগরণে এবং এক্ষণকার ক্লেশে বালিকার তন্দ্রা আসিল। কুন্দনন্দিনী রাত্রি-দিবা জাগিয়া পিতৃসেবা করিয়াছিল; নিদ্রাকর্ষণ হইলে কুন্দ-নন্দিনী তালবৃন্তহস্তে সেই অনাবৃত কঠিন শীতল হর্ম্ম্যতলে আপন মৃণালনিন্দিত বাহূপরি মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা গেল।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ উজ্জ্বল নীল, সেই প্রভাময় নীল আকাশমণ্ডলে যেন বৃহৎ চন্দ্রমণ্ডলের বিকাশ হইয়াছে। এত বড় চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ কখন দেখে নাই। তাহার দীপ্তিও অতিশয় ভাস্বর, অথচ নয়নস্নিগ্ধকর। কিন্তু সেই রমণীয় প্রকাণ্ড চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে চন্দ্র নাই; তৎপরিবর্ত্তে কুন্দ মণ্ডলমধ্য-

বর্ত্তিনী এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী দৈবী মূর্ত্তি দেখিল। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিসনাথ চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ-গগন পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছিল। ক্রমে সেই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্র শীতলরশ্মি স্ফুরিত করিয়া কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল। তখন কুন্দ দেখিল যে, সেই মণ্ডলমধ্য-শোভিনী, আলোকময়ী, কিরীট-কুণ্ডলাদিভূষণালঙ্কৃতা মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্টা। রমণীর কারুণ্যপরিপূর্ণ মুখমণ্ডল; স্নেহ-পরিপূর্ণ হাস্য অধরে স্ফুরিত হইতেছে। তখন কুন্দ সভয়ে সানন্দে চিনিল যে, সেই করুণাময়ী তাহার বহুকাল-মৃতা প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে। আলোকময়ী সস্নেহাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উত্থিত করিয়া ক্রোড়ে লইলেন, এবং মাতৃহীনা কুন্দ বহুকাল পরে "মা" কথা মুখে আনিয়া যেন চরিতার্থ হইল। পরে জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যস্থা, কুন্দের মুখচুম্বন করিয়া বলি-লেন, "বাছা, তুই বিস্তর দুঃখ পাইয়াছিস্। আমি জানিতেছি যে, তুই বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর বালিকা-বয়ঃ, এই কুসুম-কোমল শরীর, তোর শরীরে সে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর এখানে থাকিস্ না, পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়। কুন্দ যেন উত্তর করিলে যে, "কোথায় যাইব?" তখন কুন্দের জননী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দ্বারা উজ্জ্বল প্রজ্বলিত নক্ষত্রলোক দেখাইয়া বলিলেন যে, "ঐ দেশে।" কুন্দ তখন যেন বহুদূরবর্ত্তী বেলাবিহীন অনন্তসাগরপারস্থবৎ অপরিজ্ঞাত নক্ষত্রলোক দৃষ্টি করিয়া কহিল, "আমি অতদূর যাইতে পারিব না, আমার বল নাই।" তখন ইহা শুনিয়া জননীর কারুণ্য-

প্রফুল্ল অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডলে অনাহ্লাদজনিতবৎ ভ্রূকুটিবিকাশ হইল, এবং তিনি মৃদুগম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "বাছা, যাহা তোমার ইচ্ছা, তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্রলোক প্রতি চাহিয়া তথায় আসিবার জন্য কাতর হইবে। আমি আর একবার তোমাকে দেখা দিব। যখন তুমি মনঃপীড়ায় ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া আমাকে মনে করিয়া, আমার কাছে আসিবার জন্য কাঁদিবে, তখন আমি আবার দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও। এখন তুমি আমার অঙ্গুলি-সঙ্কেতনীত-নয়নে আকাশপ্রান্তে চাহিয়া দেখ। আমি তোমাকে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার, তবে ইহা-দিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে, সে পথে যাইও না।"

তখন জ্যোতির্ম্ময়ী অঙ্গুলিসঙ্কেতদ্বারা গগনোপান্ত দেখাই-লেন। কুন্দ তৎসঙ্কেতানুসারে দেখিল, নীলগগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাট ; সরল সকরুণ কটাক্ষ ; তাঁহার মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ-বঙ্কিম গ্রীবা এবং অন্যান্য মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইঁহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। তখন ক্রমে ক্রমে সে প্রতিমূর্ত্তি জলবুদ্‌বুদবৎ গগনপটে বিলীন হইলে, জননী কুন্দকে কহিলেন, "ইঁহার দেবকান্ত রূপ দেখিয়া ভুলিও না। ইনি মহাশয় হইলেও তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধরবোধে ইঁহাকে ত্যাগ করিও।" পরে আলোকময়ী

পুনশ্চ "ঐ দেখ" বলিয়া গগনপ্রান্তে নির্দ্দেশ করিলে, কুন্দ দ্বিতীয় মূর্ত্তি আকাশের নীলপটে চিত্রিত দেখিল। কিন্তু এবার পুরুষমূর্ত্তি নহে। কুন্দ তথায় এক উজ্জ্বল-শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশ-নয়না যুবতী দেখিল। তাহাকে দেখিয়াও কুন্দ ভীতা হইল না। জননী কহিলেন, "এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী! ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।"

ইহা বলিতে বলিতে সহসা আকাশ অন্ধকারময় হইল, বৃহচ্চন্দ্র-মণ্ডল আকাশে অন্তর্হিত হইল, এবং তৎসহিত তন্মধ্যসংবর্ত্তিনী তেজোময়ীও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

(২)—চন্দ্রলোক।

[নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞান রহস্য'-নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। নীরস বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও বঙ্কিমের প্রতিভাস্পর্শে কিরূপ সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই প্রবন্ধ অক্ষয়কুমার দত্তের 'মেঘ ও বৃষ্টি'-নামক প্রবন্ধের সহিত তুলনা করিলেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিশেষত্ব ও তাঁহার উচ্চতর লিপিকুশলতা সহজে উপলব্ধ হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা কোথাও কষ্টকল্পিত নহে; তাহার গতি অতি সরল ও স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার শিল্পনৈপুণ্য এবং শব্দসম্পদ্ উভয়ই বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়।]

এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য্য করিয়া-ছেন। বর্ণনায়, উপমায়—বিচ্ছেদে, মিলনে—অলঙ্কারে,

খোষামদে—তিনি উলটি-পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকরলেখা ইত্যাদি সাধারণ-ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; সুধাকর, হিমকরকরনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে বাঙ্গালী বালকের মন মুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্যকুঞ্জে লীলাখেলা করিয়া, কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞানদৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই।

যখন অভিমন্যুশোকে ভদ্রার্জ্জুন অত্যন্ত কাতর, তখন তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগনসমুদ্রে এই সুবর্ণের দ্বীপ দেখি, আমরাও মনে করি, বুঝি, এই সুবর্ণময় লোকে সোণার মানুষ সোণার থালে সোণার মাছ ভাজিয়া সোণার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে, এবং অপূর্ব্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে—এ পোড়া লোকে যেন কেহ যায় না।—এ দগ্ধ মরুভূমি মাত্র। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে সৌর জগতের সঙ্গে চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র যুগল-গ্রহ। উভয়ে এক পথে একত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ-কেন্দ্রের বশবর্ত্তী—কিন্তু পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের একাশী গুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক যে, সেই

যুক্ত আকর্ষণের কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত; এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ বোধ হয়। সাধারণ পাঠক বুঝিবেন যে, চন্দ্র একটী ক্ষুদ্রতর পৃথিবী; ইহার ব্যাস ১৪৫০ ক্রোশ, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী।

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ মাত্র—ত্রিশ হাজার যোজন মাত্র, গাগনিক গণনায় এ দূরতা অতি সামান্য—এপাড়া ওপাড়া। ত্রিশটি পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্রে গিয়া লাগে।

সুতরাং আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্ত্তী মনে করেন। তাঁহাদিগের কৌশলে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা চন্দ্রাদিকে ২৪০০ গুণ বৃহত্তর দেখা যায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, চন্দ্র যদি আমাদিগের নেত্র হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাম, এক্ষণেও ঐ সকল দূরবীক্ষণ-সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পারি।

এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? দেখা যায় যে, তিনি হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেবতা নহেন, জ্যোতির্ম্ময় কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাষাণময় আগ্নেয়গিরি-পরিপূর্ণ জড়পিণ্ড। কোথাও অত্যুন্নত পর্ব্বত-মালা—কোথাও গভীর গহ্বররাজি। আমরা পৃথিবীতে দেখি যে, যাহা রৌদ্র প্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রও রৌদ্রপ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল। কিন্তু যে স্থানে রৌদ্র না লাগে, সে স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে যে, চন্দ্রের কলায় কলায়

দূরবীক্ষণে চন্দ্র যেরূপ দৃষ্ট হয়।

হ্রাস-বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটিয়া থাকে। সে তত্ত্ব বুঝাইয়া লিখি-বার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে, যে স্থান উন্নত সেই স্থানে রৌদ্র লাগে—সেই স্থান আমরা উজ্জ্বল দেখি—যে স্থানে গহ্বর অথবা পর্ব্বতের ছায়া, সে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না—সেই স্থানগুলি আমরা কালিমাপূর্ণ দেখি, সেই অনুজ্জ্বল রৌদ্রশূন্য স্থানগুলিই কলঙ্ক—অথবা "মৃগ"—প্রাচীন-দিগের মতে সেইগুলিই "কদমতলায় বুড়ী চরকা কাটিতেছে।"

চন্দ্রের বহির্ভাগের এরূপ সূক্ষ্মাণসূক্ষ্ম অনুসন্ধান হইয়াছে যে, তাহাতে চন্দ্রের উৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার পর্ব্বতাবলী ও প্রদেশ সকল নাম-প্রাপ্ত হইয়াছে—এবং তাহার পর্ব্বতমালার উচ্চতা পরিমিত হইয়াছে। বেয়র ও মাল্লর নামক সুপরিচিত জ্যোতির্ব্বিদ্‌দ্বয় অন্যূন ১০৯৫টি চান্দ্র পর্ব্ব-তের উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে মনুষ্যে যে পর্ব্বতের নাম রাখিয়াছে "নিউটন", তাহার উচ্চতা ২২, ৮২৩ ফীট। এতাদৃশ উচ্চ পর্ব্বত-শিখর পৃথিবীতে আন্দিস্‌ ও হিমালয়-শ্রেণী ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশদ্‌ ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের এক ভাগ মাত্র; অতএব পৃথিবীর তুলনায় চান্দ্র পর্ব্বতসকল অত্যন্ত উচ্চ। চন্দ্রের তুলনায় নিউটন যেমন উচ্চ, চিম্বারোজা নামক বৃহৎ পার্থিব শিখরের অবয়ব আর পঞ্চাশদ্‌গুণে বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর তুলনায় তত উচ্চ হইত।

চান্দ্র পর্ব্বত যে কেবল আশ্চর্য্য উচ্চ, এমত নহে; চন্দ্র-লোকে আগ্নেয় পর্ব্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত আগ্নেয়

পর্ব্বতশ্রেণী অগ্ন্যুদ্গারী বিশাল রন্ধ্রসকল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে—যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বাল-প্রাপ্ত হইয়া কোন কালে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল সহস্রধা বিভিন্ন, সহস্র সহস্র বিবর-বিশিষ্ট,—কেবল পাষাণ, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ-পাষাণময়।

এইত পোড়া চন্দ্রলোক! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এখানে জীবের বসতি আছে কি? আমরা যতদূর জানি, জল-বায়ু ভিন্ন জীবের বসতি নাই,—যেখানে জল বা বায়ু নাই, সেখানে আমাদের জ্ঞানগোচরে জীব থাকিতে পারে না। যদি চন্দ্র-লোকে জল-বায়ু থাকে, তবে, সেখানে জীব থাকিতে পারে; যদি জল বায়ু না থাকে, তবে জীব নাই, এক প্রকার সিদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে দেখা যাউক, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে।

মনে কর, চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় বায়বীয় মণ্ডলে বেষ্টিত। মনে কর, কোন নক্ষত্র, চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গতি করিবে। নক্ষত্র চন্দ্র কর্ত্তৃক সমাবৃত হইবার কালে প্রথমে, বায়ুস্তরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে; তৎপরে চন্দ্র-শরীরের পশ্চাতে লুকাইবে। যখন বায়বীয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র যাইবে, তখন নক্ষত্র পূর্ব্ব-মত উজ্জ্বল বোধ হইবে না; কেন না, বায়ু আলোকের কিয়ৎ-পরিমাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে। নিকটস্থ বস্তু আমরা যত স্পষ্ট দেখি, দূরস্থ বস্তু আমরা তত স্পষ্ট দেখিতে পাই না—তাহার কারণ মধ্যবর্ত্তী বায়ুস্তর। অতএব সমাবরণীয় নক্ষত্র ক্রমে হ্রস্বতেজাঃ হইয়া পরে চন্দ্রান্তরালে অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এরূপ ঘটিয়া থাকে না। সমাবরণীয় নক্ষত্র একেবারেই নিবিয়া

যায়—নিবিবার পূর্ব্বে তাহার উজ্জ্বলতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। চন্দ্রে বায়ু থাকিলে কখন এরূপ হইত না।

চন্দ্রে যে জল নাই তাহারও প্রমাণ আছে ; কিন্তু সে প্রমাণ অতি দুরূহ—সাধারণ পাঠককে অল্পে বুঝান যাইবে না ; এবং এই সকল প্রমাণ বর্ণরেখাপরীক্ষক যন্ত্রের বিচিত্র পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে ; চন্দ্রলোকে জলও নাই, বায়ুও নাই। যদি জলবায়ু না থাকে, তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব তথায় নাই।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা উপসংহার করিব। চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে। চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সংবর্ত্তন করে ; অতএব আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেখ, যে, পৌষ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা এত তাপাধিক্য ভোগ করি তাহার কারণ পৌষমাসে দিন ছোট, জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন তিন চারি ঘণ্টা বড়। যদি দিনমান তিন চারি ঘণ্টা বড় হইলেই এত তাপাধিক্য হয়, তবে পাক্ষিক চান্দ্র দিবসে না জানি চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। তাহাতে আবার পৃথিবীতে জল, বায়ু, মেঘ আছে—তজ্জন্য পার্থিব সন্তাপ বিশেষপ্রকারে শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জল—বায়ু—মেঘ ইত্যাদি চন্দ্রে কিছুই নাই ; তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষাণময়, অতি সহজে, উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। লর্ড রস চন্দ্রের তাপ পরিমিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ যে

তত্তুলনায় যে জল অগ্নিসংস্পর্শে ফুটিতেছে, তাহাও শীতল। সে সন্তাপে কোন পার্থিব জীব রক্ষা পাইতে পারে না—মুহূর্ত্তের জন্যও রক্ষা পাইতে পারে না। এই কি 'শীতরশ্মি', 'হিমকর', 'সুধাংশু'? হায়! হায়! অন্ধ পুত্রকে পদ্মলোচন আর কেমন করিয়া বলিতে হয়?

অতএব সুখের চন্দ্রলোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। চন্দ্রলোক পাষাণময়,—বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ—পাষাণময়! জলশূন্য, সাগরশূন্য, নদীশূন্য, তড়াগশূন্য, বায়ুশূন্য, বৃষ্টিশূন্য—জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, উত্তপ্ত, জ্বলন্ত, নরককুণ্ডতুল্য এই চন্দ্রলোক!

এই জন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কাব্য গড়ে—বিজ্ঞান ভাঙ্গে।

৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ঐহিক অমরতা।

[কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালা ভাষায় একজন অতিশয় উচ্চশ্রেণীর বক্তা ছিলেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলিতেও বাগ্মিজনোচিত ওজস্বিতা, আবেগপূর্ণতা ও পদবিন্যাসকৌশল সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। তিনি শব্দের বিশুদ্ধির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, এবং সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রচুর বিশুদ্ধ পদ সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালাগদ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সর্ব্বদা যত্নবান্ ছিলেন। ব্যাকরণদুষ্ট পদের পরিহারবিষয়ে তাঁহার রচনা বিদ্যাসাগর ও তারাশঙ্করের রচনার সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু তিনি আবশ্যকমতে বাঙ্গলাভাষার বিচিত্র ভাণ্ডার হইতে শব্দ-গ্রহণ করিয়া নিজ রচনার বৈচিত্র্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। এ বিষয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রুচির অনুবর্ত্তন করিয়াছেন।

নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধ তাঁহার 'নিভৃত-চিন্তা' হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন "চিন্তাশীল লেখক" বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা 'প্রভাত-চিন্তা' 'নিশীথ-চিন্তা' ও 'নিভৃত-চিন্তা' নামক বহু-বিধ-তত্ত্বচিন্তাপূর্ণ গ্রন্থত্রয়ই তাহার হেতু। কালীপ্রসন্নের সকল গ্রন্থই গভীরভাবপূর্ণ এবং তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।]

পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান! পর্ব্বতে উচ্চতা আছে, নদীর তরঙ্গে শোভা আছে, নদী-প্রবাহসম্মিলিত সমুদ্রের বক্ষে অনির্ব্বচনীয় বিস্তার আছে;—ফুলে মধু, ফুলভরাবনত লতাদেহে মাধুরী এবং লতার আকণ্ঠ-বিসর্পিবেষ্টনবদ্ধ অচল-পাদপে গরিমার এক অপূর্ব্ব বিলাসভঙ্গি

আছে। কবি অথবা ভাবুকের চক্ষু লইয়া দেখিতে হইলে, দেখিবার এইরূপ কত বস্তুই যে চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে? আবার মানুষী শক্তির জয়স্তম্ভ দেখিতে হইলে নগর, উপনগর. দুর্গ, সেতু, জলযান, স্থলযান, ব্যোমযান, আগ্রার তাজ এবং মিসরের পিরামিড প্রভৃতি কতই কি না মনুষ্যচক্ষুর সন্নিহিত হইতেছে? কিন্তু দৃশ্য পদার্থের গূঢ় গৌরব ভাবিয়া দেখিলে, তথাপি ইহাই পুনঃ পুনঃ বলিতে ইচ্ছা হয় যে, পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকা গৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান। এই দুইয়ের তুলনা নাই। জলে যেমন জলবুদ্বুদের উদয় ও বিলয় হইতেছে, বসুন্ধরার বক্ষঃস্থলরূপ বিশাল নিকেতনে, সূতিকা ও শ্মশানের প্রকোষ্ঠদ্বয়েও, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি নিমেষে, সেইরূপ অসংখ্য প্রাণীর উদয় ও বিলয় অথবা আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে। যে ছিল না, সে আসিতেছে। যে ছিল, সে চলিয়া যাইতেছে। যাহাকে দেখি নাই, সে নয়নপথের নূতন পথিক হইয়া হাসিতেছে, নাচিতেছে এবং ভালবাসার বাহু প্রসারিয়া বুকে আসিতে যত্ন পাইতেছে। যাহাকে দেখিতাম, জানিতাম, ভালবাসিতাম, সে যেন নয়নপথের অন্তরালে অনন্ত ও অতলস্পর্শ অন্ধকার সমুদ্রে নিলীন হইতেছে।

জন্মমৃত্যুর এই আবর্ত্তগতি গাঢ়রূপে চিন্তা করিলে মনে আপনা হইতেই দুইটি গভীর প্রশ্নের উদয় হয়। প্রথম প্রশ্ন এই,—যাহারা এই জগতে নূতন প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহারা কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? কে তাহাদিগকে

মশরের পিরামিড

আনিল? কে তাহাদিগকে জীবন দান করিয়া এই সংসারে সুখদুঃখের তরঙ্গে তাহাদিগের জীবনতরী ভাসাইয়া দিল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে,—যাহারা যায়, তাহারা কোথায় যায়? মৃত্যু তাহাদিগের নির্ব্বাণ না তিরোধান? মৃত্যুর পর তাহাদিগের আর কিছু থাকে কি? যাহাদিগের সুকুমারতনু সমাধির ক্রোড়ে কিংবা শ্মশানানলে উৎসর্গ দিয়া আসিলে, এই জগতের সহিত তাহাদিগের আর কোন সম্বন্ধ রহিল কি? এত আশা, এত ভালবাসার এই কি শেষ? যাহাকে পলকের তরে হারাইলে প্রলয় জ্ঞান হইত, তাহাকে কি একবারে চিরদিনের জন্যই হারাইতে হইবে? অথবা যাঁহারা এই পৃথিবীর মঙ্গলকামনায় প্রাণত্যাগেও কুণ্ঠিত হন নাই,—যাঁহাদিগের প্রেমাশ্রুতে স্নাত হইয়াই ইহা রমণীয় পুষ্পোদ্যান ও পূজ্যস্থান বলিয়া জগতে আদৃত হইয়াছে, পৃথিবী আর কি কখনও তাঁহাদিগকে আপনার জন বলিয়া মনে করিতে পাইবে না? সেই ত অযোধ্যা আজিও সরযূর তটে শয়ান রহিয়াছে। কিন্তু অযোধ্যার সে রাম কৈ? সরযূর কলকলায়মান সলিলরাশি যাঁহার পাদস্পর্শে পবিত্র হইত,—যাঁহার স্নেহশীতল গম্ভীরমূর্ত্তি আপনার হৃদয়াদর্শে অঙ্কিত দেখিয়া আনন্দভরে ফুলিয়া উঠিত, সেই রঘুকুলতিলক দয়ার অবতার কৈ? সেই ত বাল্মীকির তপোবন পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাল্মীকির সে বীণা কৈ? বীণার সে ঝঙ্কার কৈ? আর বাল্মীকি যাঁহাকে প্রীতির পুতলি ও পবিত্রতার প্রতিকৃতি বলিয়া জানিতেন, এবং যাঁহাকে এই জন্যই জননী ও দুহিতা

অপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসিতেন, অবলাকুলের আভরণ-রূপিণী সেই অ-লোকসামান্যা জানকী কৈ? সেই গঙ্গা, সেই যমুনা, তেমনই মৃদু মৃদু মধুরনাদে বহিয়া যাইতেছে,—সেই কুরুক্ষেত্র, সেই উজ্জয়িনী চৈত্ররৌদ্রের খরজ্যোতিতে তেমনই ধূ ধূ করিতেছে। কিন্তু গঙ্গার লহরী যাঁহাদিগের জলদগম্ভীর স্বরলহরীর সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিত, সেই ভগবদ্ভক্ত জগদ্‌গুরু আর্য্যতাপসেরা কৈ? যমুনার শ্যাম সলিল যাঁহা-দিগের শৌর্য্যপ্রবাহ-স্বরূপ শোণিতধারায় জবামাল্যভূষিতা রণরঙ্গিণী শ্যামার ন্যায় ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যে সুন্দর হইত, সেই পৌরব ও যাদব কৈ? উজ্জয়িনী আছে, উজ্জয়িনীর সেই বিক্রম কৈ? কালিদাস কৈ? কুরুক্ষেত্র আছে, কুরুক্ষেত্রের সেই কৌরব কৈ? যিনি বিনা যুদ্ধে অণুপরিমাণ ভূমিদানেও অসম্মত ছিলেন, সেই অভিমানদগ্ধ কুরুরাজ কৈ?

মনুষ্য সূতিকা গৃহের আনন্দকোলাহলে অধীর ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া জন্মতত্ত্বের আদি চিন্তায় উদাসীন রহিতে পারে; এবং যাহার জীবনের স্রোত, জোয়ারের নূতন স্রোতের ন্যায়, আবিল আমোদের ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে বহিয়া যায়, সেও জীব-নের উদ্দেশ্যচিন্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষা দেখাইতে পারে। দিন দিন করিয়া দিন যায়, না বর্ষ বাড়ে। তাহার আর ভাবনা কি? শীত যায়, গ্রীষ্ম আইসে; গ্রীষ্ম যায়, শীত আইসে। তাহার আর চিন্তা কি? কিন্তু শ্মশানই যাহার শেষ গতি এবং সমাধিতেই যাহার শেষ সুপ্তি, সুখী হউক আর দুঃখী হউক, মৃত্যুচিন্তা সম্বন্ধে সে কিরূপে ঔদাস্য ও উপেক্ষা দেখাইবে? এই সংসারে

কোথায় কে কবে আসিয়াছিল, যাহাকে যাইতে হয় নাই? কোথায় কে কবে জন্মিয়াছিল, যে একদিন শ্মশানের সম্মুখীন হয় নাই? যে ধনী, তাহারও শেষ শয্যা শ্মশান; এবং যে মনুষ্যকুলে জন্ম লাভ করিয়া, মনুষ্যের সুখদুঃখ হর্ষবিষাদে সর্ব্বতোভাবে স্বত্ববান্ হইয়াও ধনিগৃহের মার্জ্জার কুক্কুরের সমান বলিয়া পরিগণিত হইল না, তাহারও শেষ শয্যা শ্মশান। আজি ময়ূরসিংহাসন কি স্বর্ণপর্য্যঙ্কের সুকোমল আস্তরণেও যাঁহার কোমলতর শরীর ক্লিষ্ট হয়, তাঁহারও শেষ শয্যা শ্মশান, এবং যে দিনান্তের পর্য্যটনে মুষ্টিভিক্ষা না পাইয়া গাছের তলায় পড়িয়া থাকে, তাহারও শেষ শয্যা শ্মশান। যেখানে আকবর সাহের সেকন্দরা বিলুপ্ত সম্পদের স্মরণস্তম্ভ স্বরূপ শোভা পাইতেছে, তাহারই চতুষ্পার্শে অসংখ্য দীন-দুঃখী ও পথের ভিখারীর অস্থি-স্তূপ অবনীর ক্রোড়ে পড়িয়া রহিয়াছে। যিনি জ্ঞানসমুদ্রের শেষ সীমা দর্শনের জন্য কপিল, কণাদ, কিংবা নিউটন কি হাম্বোল্ডের ন্যায় অক্লান্তমনে সন্তরণ করিয়াছেন, তিনিও এইক্ষণ শ্মশানে; আর যাহারা পৃথিবীতে আসিয়া, খাইয়া, শুইয়া, হাসিয়া, ঢলিয়া এবং দর্পণে আপনাদিগেরও মুখখানি মাত্র দেখিয়াই চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের শেষ স্থান এইক্ষণ শ্মশান।

হেলেনার মত রূপসী এবং রূপলাবণ্য-বর্জ্জিতা কাঙ্গালিনী, বড় আর ছোট, বৃদ্ধ ও শিশু, যে যেখান হইতে অন্তর্হিত হইতেছে, তাহারই বাহির হইবার পথ শ্মশান। সুতরাং শ্মশানের পর পারে কি, এই প্রশ্ন মনুষ্য-মাত্রকেই কোন না কোন সময়ে

চিন্তায় অভিভূত করে, এবং মরিয়াও অমর হওয়া যায় কিনা, এই আকাঙ্ক্ষা সকলকেই কোন না কোন সময়ে আকুল করিয়া তুলে। শত শতাব্দী হইল, গার্গি ও নচিকেতা জ্ঞানের প্রথম অভ্যুদয়েই এই প্রশ্ন লইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহাদিগের অতি সামান্য চিন্তাশক্তি আছে, তাঁহারা আজিও জীবনের কোন না কোন মুহূর্ত্তে চিত্তের ভারে অবনত হইয়া, আকাশের চন্দ্র তারা, বনের বৃক্ষ লতা, এবং কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী ও মনুষ্য, সকলের কাছেই এই প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কিন্তু কে ইহার উত্তর করিবে ?

বিজ্ঞানের নিকট এই ভয়াবহ প্রশ্নের উত্তর নাই। বিজ্ঞান সমাধির মৃত্তিকা তুলিয়া অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, যে চলিয়া গিয়াছে, সেই মৃত্তিকায় তাহার কোন চিহ্ন পায় নাই। বিজ্ঞান শ্মশানের ভস্মরাশিকে বিবিধ যন্ত্রযোগে রেণু রেণু বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছে; সেই ভস্মরাশির মধ্যে ভস্ম বই আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। বৈজ্ঞানিকের এক চক্ষু দূরবীক্ষণ, আর চক্ষু অণুবীক্ষণ। যাহা দূরবীক্ষণে দেখা যায় না, এবং অণুবীক্ষণেও অনুমেয় হয় না, প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক তাহা মানিবে কেন ? সুতরাং বৈজ্ঞানিকের নিকট শ্মশানের পরপার অন্ধকার !! তবে বিজ্ঞানের কাছে সেই অন্ধকারের মধ্যেও এই একটু মাত্র আলোকের আভা পাওয়া যায় যে, এ জগতে কিছুরই বিনাশ নাই। যেখানে একদিন পাহাড় ছিল, সেখানে আজ সমুদ্র; যেখানে একদিন সমুদ্র ছিল, সেখানে আজ পাহাড়। আপাততঃ দেখিতে গেলে,

পাহাড় ও সমুদ্রের ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞান ইহা জানে যে, যে সকল পরমাণু পাহাড় ও সমুদ্রের উপাদান ছিল, তাহারা জগদ্‌যন্ত্রের চক্রের সঙ্গে বিঘূর্ণিত হইয়া অদ্যাপি অবিনশ্বর রহিয়াছে। জল আগুনে শুকায়, আগুন জলসেকে নিবিয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞান ইহা উপদেশ করে যে, যে সকল পদার্থ জল ও আগুনের উপাদান, তাহার একটিরও বিনাশ হয় না। ফুল ঝরিয়া পড়ে, ফল পচিয়া যায়, অসংখ্য তরুরাজি-পূর্ণ অটবী দাবদাহে পুড়িয়া ছাই হয়;—গ্রাম ও নগর, দরিদ্রের কুটীর, সমৃদ্ধের প্রাসাদ, বিলাসীর নিকুঞ্জ ও বিবেকীর ভজনাগৃহ প্রভৃতি সুন্দর ও কুৎসিত এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী সমস্ত সামগ্রী লইয়া, সহসা নদীর গর্ভে প্রবেশ করে। কিন্তু বিজ্ঞানইহা শিক্ষা দেয় যে, ফুল ও ফলের রূপান্তর মাত্র হইয়াছে, যে সকল উপকরণ ফুল ও ফলের দেহ গঠন করিয়া সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহার একটিও বিনষ্ট হয় নাই;—অটবীর আকৃতি মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অটবীর উপাদান পদার্থ নিচয়ের একটিও হারাণ যায় নাই; এবং যে সকল বস্তু গ্রাম ও নগরের সহিত নদীর জলে ধুইয়া গিয়াছিল, তাহারাই আবার দ্বীপ ও উপদ্বীপের মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, নূতন তরুলতার ও নূতন শস্যসম্পদের সহিত জলরাশির মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে; তাহার একটিরেণুকাও বিলুপ্ত হয় নাই। বিজ্ঞান এইরূপ অসংখ্য প্রমাণ সহকারে প্রতিপাদন করে যে, বিনাশ এই শব্দটি নিরর্থক ও ভ্রমাত্মক। কিছুরই কোন দিন বিনাশ হয় নাই, বিশ্বে কিছুরই কোন দিন বিনাশ হইবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের

গতি এই পর্য্যন্ত যাইয়াই অবরুদ্ধ হয়। বিনাশ না হইলে মনুষ্যের শেষ গতি কি? বিজ্ঞান এখানে নিরুত্তর।

মনুষ্যের হৃদয়, প্রথমে বিজ্ঞানের কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, পরে বিজ্ঞানের নিরাশ-কঠোর বাদবিতর্কে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা দেখাইয়া, কখনও আশার অর্দ্ধস্ফুট আলোকে, কখনও কল্পনার অস্ফুট অথচ কমনীয় জ্যোৎস্নায়, কখনও মমতার প্রণোদনে, কখনও বিবেকের তাড়নায়, এবং সৌভাগ্যবশতঃ কোন কোন স্থলে সূক্ষ্মালোকদর্শিনী ভক্তির সুমধুর সান্ত্বনায়, নানাভাবে এই প্রশ্নের নানাবিধ মীমাংসা করিয়াছে; এবং সেই সকল মীমাংসাকে ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিয়া সমগ্র মনুষ্যজাতিকে সেখানে আসিয়া আশ্রয় লইবার জন্য মা ভৈষীঃ বলিয়া আহ্বান করিতেছে। আভাসেই ইহা উপলব্ধ হইবে যে, সে মীমাংসার শেষ স্থল স্বর্গ,—শেষ লক্ষ্য পরকাল। তুমি ভাল বাসিয়া বঞ্চিত হইয়াছ, পরকালে তোমার বিচার হইবে; আর তুমি বঞ্চনার অভিলাষে ভালবাসার বাগুরা বিস্তার করিয়াছ, তুমিও পরকালে ন্যায়ের বিচার দেখিবে। তুমি ন্যায়ের অনুরোধে স্বার্থত্যাগ করিয়া ভিখারী বনিয়াছ, দয়ার অনুরোধে আপনার মুখের গ্রাস পরের মুখে তুলিয়া দিয়াছ, এবং প্রীতির অনুরোধে আপনি পদানত রহিয়াও পরচিত্ত বিনোদন করিয়াছ, পরকালে তোমার বিচার হইবে;—আর তুমি স্বসুখবাসনার সুপরিমার্জ্জিত বেদির নিকট ন্যায়, ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধনীকে অ-ভ্রূভঙ্গে বলিদান করিয়া নিতান্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছ, ক্ষুধাতুরের মুখের গ্রাস কাঁড়িয়া আনিয়া আপনার পূর্ণ উদর পুনঃ

পূরণ করিয়াছ, এবং প্রীতির কোমলতনু আগুনে পোড়াইয়া আনন্দে খল খল করিয়া হাসিয়াছ; তুমিও পরকালে ন্যায়ের বিচার দেখিতে পাইবে। দুঃখি! দুঃখ করিও না, পরকাল আছে; শোকি! শোক করিও না, পরকাল আছে। পরকালে শোকের অবসান—শান্তি কিংবা সম্মিলন, পরকালে দুঃখের অবসান—সুখ। যে তৃষ্ণা হৃদয়কে ইহকালে তুষানলের ন্যায় দহন মাত্র করিল, আর কিছুই পাইল না, যদি উহা নির্ম্মল হয়, তবে উহার তৃপ্তির চরম স্থল পরকাল; এবং যে আশা মনুষ্যের মৃগ-চঞ্চলা মনোবৃত্তিকে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিগ্‌দিগ-ন্তরে ও দেশদেশান্তরে ঘুরাইল,—যে আশা মনুষ্যকে পৃথিবীতেই স্বর্গ-সম্পদের প্রতিবিম্ব দেখাইবে বলিয়া তাহাকে আকাশে উঠাইল, সাগরে ডুবাইল এবং অসাধ্য সাধনে শক্তি দিল, যদি ন্যায়োপেত হয়, তবে উহার শেষ সাফল্য পরকালে।

ইতিহাস অথবা মানবজনীন স্মৃতি তৃতীয় এক প্রকারে প্রস্তাবিত প্রশ্নের উত্তর করিতেছে এবং উহা মনুষ্যের আত্মাকে বিজ্ঞানের ন্যায় অন্ধকারে না ডুবাইয়া এবং হৃদয়োদ্ভূত আশার ন্যায় লোকান্তরের আপর্থিবজগতেও প্রেরণ না করিয়া ইহ-লোকেই অমরতার আশ্বাস দিতেছে। ইহা বলা অনাবশ্যক যে, আমরা পারলৌকিক আশার যে সকল কথা উল্লেখ করি-য়াছি, সেগুলি পৃথিবীর পুরাতন ও নূতন, সুসভ্য ও অসভ্য, সমুদয় জাতিরই জীবনগ্রন্থির সহিত গ্রথিত রহিয়াছে, এবং কবিতাও সেই সকল কথার অমৃতপ্রবাহে অভিষিক্ত হইয়াই সংসারের দগ্ধমরুতে অমৃত সেচন করিতেছে। মনুষ্যের ভাষা

যখন শিশুর আধ' আধ' বোলের ন্যায় কথা কহিতে আরম্ভ মাত্র করিয়াছে, তখন উহা ঐ সকল ভাবই অপরিস্ফুটস্বরে, আশঙ্কিত কণ্ঠে আধ' আধ' ব্যক্ত করিয়াছে, এবং মানবীয় সাহিত্যের মত্তপ্রবাহিনী যখন শতমুখী ভাগীরথীর ন্যায় শতদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তখনও ঐ সকল ভাবেরই ভার বহন করিয়া উহা আপনি গৌরবে স্ফীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে কারণে মনুষ্যের উৎপত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাই নাই, মনুষ্যের আধ্যাত্মিক পরকাল সম্বন্ধেও আমরা সেই কারণেই এইক্ষণ কিছু বলিব না। মনুষ্য ইতিহাসের অভ্রান্ত আলোকেও শ্মশানের পরপারে কিছু দেখিতে পায় কি না, শুধু ইহাই এইক্ষণ আমাদের আলোচনার বিষয়।

তবে ইতিহাস কি আশার পরকাল সম্বন্ধে সন্দিহান? তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইতিহাসের আর এক নাম স্মৃতি, অথবা স্মৃতিতেই উহা গঠিত এবং অনুপ্রাণিত। স্মৃতি যদি আশার কার্য্য না করে, তাহা হইলে উহা স্মৃতির অপরাধ নহে; এবং ইতিহাস ও যদি অধ্যাত্মজ্ঞানের ফল প্রদানে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাও ইতিহাসের অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। ইতিহাস কি বলিতেছে? যাহা স্মৃতি প্রীতির উচ্ছ্বাসে সর্ব্বত্র বলিয়া বলিয়া অবসন্ন হয়, ইতিহাসও শৈলশৃঙ্গসমারূঢ় সর্ব্বদর্শী সিদ্ধযোগীর ন্যায়, গভীর অথচ মোহনস্বরে, সেই কথাই দিনে নিশীথে সর্ব্বত্র বলিতেছে,—

'আমি ভুলি না'

এবং সেই সুখশীতল সুগভীর কথা নিস্তব্ধ যামিনীর বংশীধ্বনির

ন্যায় পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, পর্ব্বতবিলম্বিনী জলদমালার পটলে পটলে,—স্রোতে,—তরঙ্গে,—নির্ঝরে,—জলপ্রপাতে,বনে বনে, কান্তারে কান্তারে, কুটীরে কুটীরে, প্রাসাদে প্রাসাদে, এবং পৃথ্বীবাসী মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—

'আমি ভুলি না'।

যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের সেবক, তাঁহারা ইতিহাসের এই কথা শুনিয়াই আশ্বস্ত আছেন,—'আমি ভুলি না,'—আর যাঁহারা কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত অথবা অন্যান্য উপায়যোগে হোমার, মিল্টন, ভল্টেয়ার, কিংবা ভবভূতি প্রভৃতির ন্যায় অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের সেবা করিতেছেন, তাঁহারাও অবসাদের অসংখ্য কারণ সত্ত্বে ইতিহাসের এই কথা শুনিয়াই সতত উদ্যম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ রহেন,—'আমি ভুলি না,'—'আমি ভুলি না'।

ইতিহাসের অস্তিত্ব কোথা হইতে?—কেন? মনুষ্য মনুষ্যকে ভুলে না, এই জন্যই মনুষ্যের ইতিহাস। মনুষ্য মনুষ্যকে ভালবাসে, এই জন্যই মনুষ্যের ইতিহাস। আর, যাহাকে ভালবাসে, মনুষ্য সকল সময়েই তাহার গুণগান ও নামকীর্ত্তন করিতে চাহে, এই জন্যই মনুষ্যের ইতিহাস। ইতিহাস এই নিমিত্ত সকলকেই সমান আদরে এই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে যে,—পৃথিবীর যেখানে যে থাক, মানসকুসুমের সৌরভ ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া মনুষ্যের মনোমোহনে যত্নশীল হও, 'আমি ভুলিব না';—পৃথিবীর যেখানে যে থাক, মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শ এবং মানুষী শক্তির শ্রেষ্ঠতর বিকাশ দেখাইয়া মনুষ্যকে উন্নতি হইতে উচ্চতর

উন্নতিতে লইয়া যাও, 'আমি ভুলিব না';—এবং পৃথিবীর যেখানে যে থাক, মনুষ্যকে ভালবাস, মনুষ্যের পরিচর্য্যা কর, মনুষ্যহিতে ব্রতী হও এবং মনুষ্যের সুখবর্দ্ধন ও মঙ্গলসাধনে স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখাও, এই সৃষ্টি যত কাল রহে, ততকাল ইহা আমি মনে রাখিব,—'আমি ভুলিব না'। ইহার নাম ঐহিক অমরতা, এবং ইতিহাস যাঁহাদিগকে ভুলে না,—যাঁহাদিগের জীবন-স্রোতের গতি ঐতিহাসিক স্মৃতির সহিত এইরূপে মিলিত হয়, যাঁহাদিগের হৃদয়-মনের প্রতিকৃতি ইতিহাসের স্মৃতিপটে এই ভাবে লিখিত হইয়া রহে, তাঁহারাই সেই অমরতার আশ্রয়পুরুষ। তাঁহারা মরিয়াও মরেন না, তাঁহারাই এই মর-ভূমিতে অমর। বিপ্লবের পর বিপ্লব এবং রাজ্য ও সমাজ লইয়া বিঘট্টনের পর বিঘট্টন হইয়া যায়, পুরাণ সৃষ্টি নূতন হয়; কিন্তু সেই সুকৃতিশালী সার্থকজন্মা মহাত্মারা বিপ্লব ও বিঘট্টনের অনন্ত ঝটিকার মধ্যেও চিরদিনই নূতন জীবন ও নূতন যৌবনে অমর রহেন।

কালিদাস মরিয়া গিয়াছেন, না বৃদ্ধ হইয়াছেন? তুমি যখন ভ্রমর-ভয়-ব্যাকুলা বিলাসচঞ্চলা শকুন্তলার সেই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল মধুরলীলা দেখিয়া আনন্দে উদ্বেল হও, কালিদাস তখন তোমার পার্শ্বচর ও প্রিয়তম বয়স্য; এবং যখন তুমি হিমাদ্রির উচ্চতম প্রস্থে কল্পনার মনোহর রথে আরোহণ করিয়া যোগিকুলধ্যেয় মহাযোগী মহেশ্বরের সেই 'নিবাত নিষ্কম্প' ধীর-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কর,—বনের বিহঙ্গ বনতরুর শাখার উপর নিস্তব্ধ বসিয়া রহিয়াছে, ভয়ে শব্দ করে না,—বনচর

মৃগাদিজন্তু চিত্রার্পিতবৎ স্ব স্ব স্থলে স্থির রহিয়াছে, ভয়ে পাদ-চারণা কিংবা মুখের অর্দ্ধাবলীঢ় শষ্প অধঃকরণ করিতে সাহস পায় না ; অদূরে বসন্তপুষ্পাভরণা বিলোলনয়না উমা, দূরে হর-বদ্ধলক্ষ্য মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, সেই কাব্যজগতের অদ্বিতীয় অনির্ব্বচ-নীয় অতুল তপঃশোভা যখন তুমি মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ কর, তখন কালিদাস আর তোমার বাহিরে নহেন। তখন কালিদাস তোমার অন্তরে, বাহিরে, অন্তরের অন্তরে,—আত্মার অভ্যন্তরে। তখন তোমার জীবন কালিদাসময়। কে বলে যে অযোধ্যা রহিয়াছে, অযোধ্যার রাম নাই ? রাম চাক্ষুষ-প্রতীতির লৌকিক জীবনে কেবল অযোধ্যায়ই অবস্থান করিতেন, এইক্ষণ যুগে যুগে জীবিত রহিয়া অসংখ্য নরনারীর প্রাণের মধ্যে অব-স্থান করিতেছেন। রামময়-জীবিতা পতিপ্রাণা সীতা একদিন 'হা রাম! হা রাম!' বলিয়া আপনার নয়নজলে ভাসিয়া-ছিলেন ; এইক্ষণ প্রীতির প্রফুল্লকমলের ন্যায় প্রীতিমুগ্ধ মনুষ্য-মাত্রেরই নয়নজলে অহোরাত্র ভাসমানা রহিয়া, যেখানে প্রীতির কথা, পবিত্রতার কথা, যেখানে অবলাজন-স্পৃহণীয় অমলসৌন্দর্য্যের কথা, সেই খানেই বিরাজমানা হইতেছেন। বাল্মীকি একস্থানে বসিয়া এক সময়ে আপনার বীণা বাজাইয়া-ছিলেন। কিন্তু এইক্ষণ যেখানে সারস্বতস্বর্গ, সেই খানেই তাঁহার বীণার ঝঙ্কার ; যেখানে আনন্দ-কুঞ্জের আনন্দ-উৎসব, সেই খানেই তাঁহার বীণার ধ্বনি,—যেখানে হৃদয় হৃদয়ের সহিত আলাপ করে,—মন মনের সহিত মিলিয়া যায়, আত্মা আত্মার সহিত আপনার বিনিময় করিতে চাহে, সেই খানেই

তাঁহার বিশ্বমোহিনী বীণার বিনোদনিস্বন। এইরূপ কত অগণিত আত্মা লোকস্মৃতির অমরাবতীকে উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছে, তাহা চাহিয়া দেখ। যদি অবনীর এই সকল সন্তানও মরিয়া গিয়া থাকেন, তবে কি জীবিত আছি আমরা? আর যদি ইঁহারা সত্য সত্যই অমর হইয়া থাকেন, তবে যে ভাবে ইঁহারা অমর হইয়া আছেন, অমরতার সেই সম্পদ্ কি আকাশকুসুম?

ইংলণ্ডের একজন অচিরগত প্রধান রাজপুরুষ রিচার্ড কব্‌-ডেনের নামস্মরণে পার্লিয়ামেণ্ট ভবনে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে,—"এই সকল লোক অনুপস্থিত থাকিলেও, পার্লিয়ামেণ্টের সভাস্থলে নিয়ত উপস্থিত।" আমরাও বলি, যাঁহারা শক্তির প্রসাদাৎ কিংবা সাধনার বলে আপনার জীবনকে বহুজীবনের সহিত মিশাইয়া গিয়াছেন,—যাঁহারা জীবনের অমৃত বিলাইয়া কিংবা আলেখ্য দেখাইয়া মনুষ্যের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে উপরে তুলিয়াছেন, তাঁহারা সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও আমা-দিগের মধ্যে সতত উপস্থিত। পৃথিবী তাঁহাদিগের তপশ্চর্য্যার পদ্মাসন,—শ্মশান তাঁহাদিগের স্বর্গারোহণের সোপানমঞ্চ।

৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জগতের সভ্যতাবৃদ্ধি বিষয়ে ভারতের কৃতিত্ব।

[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নানা ভাষায় অতিশয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইনি অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার রচিত বহু প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণের শিশুপাঠ্য 'বাঙ্গালার ইতিহাস' এককালে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট খুব পরিচিত ছিল। তাঁহার এই শেষোক্ত গ্রন্থ ও তদ্রচিত প্রবন্ধাবলির প্রায় সর্ব্বত্রই গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের প্রচুর নিদর্শন বর্ত্তমান। রাজকৃষ্ণের ভাষা বেশ সংযত, গম্ভীর এবং স্থানে স্থানে অত্যন্ত মধুর ও ওজস্বিতাপূর্ণ।]

ভারতবর্ষের মহিমা নিবিড়তমসাচ্ছন্ন। ভারতভূমি মানব-সমাজের কি কি উপকার সাধন করিয়াছেন, ভারতসন্তানেরাও ভাবিয়া দেখেন কি না, সন্দেহ। আমরা জানি যে, বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিগণ য়িহুদী দেশ হইতে ধর্ম্ম, রোমের নিকট হইতে ব্যবস্থা ও রাজনীতি, এবং গ্রীসের নিকট হইতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও শিল্প প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভূমণ্ডলের উন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, আমাদিগের মধ্যে কয়জন লোক অবগত আছেন? এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আমরা এতদ্বিষয়ের সমালোচনা করিব।

বিজ্ঞান লইয়াই বর্ত্তমান সভ্য জাতিদিগের গৌরব; এই নিমিত্ত আমরা প্রথমে বিজ্ঞানের কথাই বলিব। গণিতই বিজ্ঞা-নের মূল; বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে শাখা যে পরিমাণে গণিতের

অধীন হয়, তাহা সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রকাশিত হওয়াতেই জ্যোতিষের এত উন্নতি। তাপ, তড়িৎ, আলোক, শব্দ প্রভৃতির কার্য্য সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারিয়াই, তাহাদিগের সম্বন্ধে বিজ্ঞানবেত্তৃগণ কত অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পদার্থ সকলের পরস্পর সংযোগ ঘটে, এই নিয়মের আবিষ্ক্রিয়া হইতেই রসায়ন উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, গণিত সম্বন্ধে ভারতবাসিগণ কি করিয়াছেন।

এক্ষণে অধিকাংশ সভ্য জনপদে যে সংখ্যালিখন-প্রণালী চলিতেছে, ভারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি। নয়টী অঙ্ক এবং শূন্যের সাহায্যে সমুদয় সংখ্যা লিখিবার রীতি ভারতবাসীরাই প্রকাশ করেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব তৎকৃত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' স্বীকার করিয়াছেন যে, পাটীগণিতের দশগুণোত্তর সংখ্যালিখন-প্রণালী হিন্দুদিগের সৃষ্টি। ইউরোপবাসিগণ আরবদিগের নিকটে পাটীগণিত শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্বিষয়ে হিন্দুদিগকে গুরু বলিয়া মানেন। এক খানি গ্রন্থে এক জন আরব গ্রন্থকারকে উল্লেখ করিয়া লিখিত আছে, "বাহাউল্‌দিন ভারতবাসীদিগকে দশগুণোত্তর প্রণালীর অঙ্কগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন। ভারতবাসীরা যে এই অঙ্কগুলির স্রষ্টা, ইহার প্রমাণ একখণ্ড আরবী কবিতাবলির প্রস্তাবনা হইতে সচরাচর প্রদত্ত হইয়া থাকে, এজন্য বলা ভাল যে, সমুদায় আরবী এবং পারসী পাটীগণিত পুস্তকেই ভারতবাসীদিগকে স্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ আছে।"

কেবল পাটীগণিত নহে, বীজগণিতও ভারতবাসীদিগের সৃষ্টি। বর্ত্তমান ইউরোপবাসীরা বীজগণিতও মুসলমানদিগের নিকটে পাইয়াছেন; বীজগণিতের 'আলজেব্রা' নামটী আরবী 'আলজিবর' শব্দ হইতে সমুৎপন্ন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিওনার্ডো-নামক ইতালিদেশীয় এক ব্যক্তি মুসলমান-দিগের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়া উহা প্রথমে ইউরোপ-খণ্ডে প্রচার করেন। আরবেরা যে বীজগণিতের স্রষ্টা নহেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা হিন্দু এবং গ্রীকজাতির ছাত্র। যিনি আরবদেশে প্রথমে বীজগণিত প্রচার করেন, তিনি যে ভারতবাসীদিগের শিষ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব লিখিয়াছেন, "গ্রীক ও হিন্দুজাতি আরবদিগের পূর্ব্বে যে, বীজগণিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; আরবেরা বীজগণিতের স্রষ্টা বলিয়া দাবিও করেন না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা যে অন্যের নিকট ঋণী, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত কথা এই যে, তাঁহারা হিন্দুদিগের নিকট সংখ্যাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা যে হিন্দুদিগের নিকট বীজগণিতও পাইয়া-ছিলেন, ইহা যেরূপ সম্ভব, যে গণিতবেত্তা ভারতবর্ষীয় পাটীগণিত শিখিয়া আরবদিগকে শিখাইয়াছিলেন, তিনি ভারতবর্ষীয় গণিতের কিছুমাত্র সাহায্য না পাইয়া বীজগণিত আবিষ্কার করিয়াছেন, একথা সেরূপ সম্ভব নহে।"

৭৭৩ খৃষ্টাব্দে খলিফা আল্‌মানসুরের রাজত্বকালে প্রথম আরব গণিতবেত্তা কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় গণিতগ্রন্থ আরবী ভাষায়

অনূদিত হয়। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে আর্য্যভট্টের জন্ম; ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বরাহমিহিরের মৃত্যু; এবং ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের জন্ম। সুতরাং যে সময়ে আরবেরা ভারতবর্ষীয় গণিত প্রাপ্ত হইলেন, সে সময়ে এদেশে বীজগণিতের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় গণিতপ্রাপ্তির পরে শতবর্ষাধিক কাল পর্য্যন্তও তাঁহারা গ্রীকগণিতের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, এবং প্রায় দুই শতাব্দী গত হইলে পর দিওফান্তসের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পাইয়াছিলেন। অতএব আরবদিগের অনেক পূর্ব্বে এদেশে বীজগণিতের চর্চ্চা হইয়াছিল, এবং তাঁহারা প্রধানতঃ এদেশেরই শিষ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন কি না, বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। গ্রেগরী আবুল ফরাজ নামক একজন আর্ম্মাণী খৃষ্টান লেখক বলেন যে, রোমক সম্রাট্ জুলিয়ানের সময়ে দিওফান্তস্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ৩৬০ খৃষ্টাব্দ দিওফান্তসের প্রাদুর্ভাবকাল; সুতরাং তিনি আর্য্যভট্টেরও শত বর্ষের পূর্ব্বের লোক হইতেছেন। কিন্তু আর্য্যভট্টও ভারতবর্ষের প্রথম গণিতবেত্তা নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে পরাশর, গর্গ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গণিতবিৎ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব আর্য্যভট্টকে দিওফান্তসের ছাত্র বলা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। আর্য্যভট্ট যে কেবল দিওফান্তসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এরূপ নহে; তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ যে প্রকার বীজগণিতের জ্ঞান দেখাইয়াছেন, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপখণ্ডে তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হইত না। এস্থলে আর

একটী বিষয়ও বিবেচনাযোগ্য। দিওফান্তস্ ব্যতিরিক্ত আর কোন গ্রীক বীজগণিতকারের নাম বা গ্রন্থ কোথাও পাওয়া যায় না; এবং প্রাচীন গ্রীক ভাষায় বীজগণিতবোধক একটি শব্দ নাই। গ্রীস দেশে বীজগণিতের চর্চ্চা থাকিলে এরূপ হইত না। ইহাতে সন্দেহ হয় যে, দিওফান্তস্ বিদেশীয় লোকের নিকট বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, "১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বম্বেলি-নামক এক ব্যক্তি একখানি বীজগণিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন; এবং উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন যে, তিনি এবং রোমের একজন উপদেশক দিও-ফান্তসের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ভারত-বর্ষীয় গ্রন্থকারদিগের বারংবার উল্লেখ দেখিয়া জানিয়াছিলেন যে, আরবদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা বীজগণিত জানিতেন।" অতএব ভারতবর্ষই যে বীজগণিতের উৎপত্তিস্থান, এতদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

গণিতের পর রসায়ন দ্বারাই বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু রসায়নের মূলও ভারতবর্ষ। ইউরোপীয় "কেমিষ্ট্রি" বা রসায়ন "আলকেমী" হইতে সমুদ্ভূত। কিন্তু "আলকেমী" নামটি আরবী। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, আরবদিগের নিকট হইতেই ইউরোপবাসিগণ রসায়নের প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা যে এতদ্দেশ হইতে এবিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চরক এবং সুশ্রুত এদেশের প্রধানচিকিৎসা-গ্রন্থ। আরবেরা বিদ্যাশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ

করিয়া অল্পকাল-মধ্যে চরক এবং সুশ্রুত অনুবাদ করিয়া লয়েন; প্রকাশ্যরূপে ভারতবাসীদিগের নিকটে আপনাদিগের ঋণ স্বীকার করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বোগ্‌দাদের বিখ্যাত বাদশাহ হারুণ আল রসিদের সভায় দুইজন হিন্দু চিকিৎসক ছিলেন। হিন্দুরা যে কেবল ভাল চিকিৎসক ছিলেন, এরূপ নহে; তাঁহারা রাসায়নিক বিদ্যায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' লিখিত আছে যে, তাঁহারা গান্ধকিক অম্ল, যাবক্ষারিক অম্ল ও লাবণিক অম্ল, তাম্র, লৌহ, সীসক, রাং এবং দস্তার অম্লজানজ ইত্যাদি অনেক রাসায়নিক-প্রক্রিয়াসমুৎপন্ন যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। এই পদার্থগুলির মধ্যে গান্ধকিক অম্লকে হিন্দুরা মহাদ্রাবক নাম দিয়াছেন; এবং এ নামটি কেমন যুক্তিসঙ্গত, ডাক্তার ওশানসীর লিখিত কয়েক পংক্তির নিম্নস্থ অনুবাদে প্রতীয়মান হইবে ঃ—
"এই দ্রাবকের সাহায্যে আমরা যাবক্ষারিক, লাবণিক প্রভৃতি অন্যান্য দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহা হইতেই আমরা সোডা, হরিতালাদি উৎপাদন করিতে পারি। ইহা রঙ্গকরের প্রক্রিয়ায় আবশ্যক, এবং ইহা হইতেই আমরা কালোমেল, কুইনাইন প্রভৃতি মহৌষধ পাইতেছি। বস্তুতঃ, যে সময়ে ইউরোপে অল্প ব্যয়ে গান্ধকিক অম্ল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে রাসায়নিক শিল্পজাত সম্বন্ধে ইউরোপের মহত্ত্বের প্রারম্ভ হইয়াছে।"

ভারতবর্ষ হইতে ভূমণ্ডলের আরও অনেক উপকার হইয়াছে। যে প্রখর প্রতিভা হইতে পাটীগণিত ও রসায়ন সমু-

ভূত, তাহারই গুণে একটি নূতন বর্ণমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে তিনটী বর্ণমালা আছে। চীনদেশীয়, ফিনিসীয়, এবং ভারতবর্ষীয়। চীনদেশীয় বর্ণমালা চীন ও জাপানে প্রচলিত। ফিনিসীয় বর্ণমালা য়িহুদী, মুসলমান এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, তিব্বত, সিংহল ও বালিদ্বীপে দৃষ্ট হয়। কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, এইরূপ উচ্চারণস্থানভেদে বর্ণোৎপত্তি কল্পিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় বর্ণমালাটি যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত, অন্য দুইটি তদ্রূপ নহে।

কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়েই ভারতবর্ষ মনুষ্যসমাজের মহদুপকার করিয়াছেন। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া জগন্মণ্ডলে প্রেমপূর্ণ সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন। তিনি রাজার পুত্র ও রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজভোগে ছিলেন। ক্ষমতাশালী পিতা, স্নেহময়ী মাতা, পতিপ্রাণা পত্নী, সুন্দর সুত, আজ্ঞাবহ দাসদাসী, অপরিমেয় অর্থ, এসকল তাঁহার ছিল; কিন্তু এসকলে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি মানবজাতির দুঃখে কাতর হইয়া রাজভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষপথের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। ক্রমে সুগভীর সুবিস্তীর্ণ সিন্ধুসলিল অতিক্রম করিয়া, তুষারমণ্ডিত, মেঘভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া, মঙ্গলবার্ত্তা দূরদেশে ছুটিল। সমুদ্র পার হইয়া সিংহল-দ্বীপে, হিমালয় অতিক্রম করিয়া চীন সাম্রাজ্যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের উজ্জ্বল তরঙ্গ লাগিল। ধর্ম্মপ্রচারকগণ দেশে দেশে

ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নূতন উৎসাহে প্রীতিবিস্ফারিত হৃদয়ে তাঁহারা জগতের হিতসাধনব্রতে ব্রতী হইলেন। সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র, সাগর বা হিমাচল, কিছুতেই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না। এইরূপে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বেই সিংহল-দ্বীপ হইতে চীন পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময়ী পাতাকা উড্ডীন হইল। অদ্যাপি ভূমণ্ডলে বুদ্ধদেবের যত শিষ্য আছে, তত আর কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাই। সকল দেশ, সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্য ধর্ম্মের দ্বার বুদ্ধদেব প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগধপতি অশোক বা প্রিয়দর্শী প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের সম্রাট্ ছিলেন; পাষাণস্তম্ভে ও গিরিগাত্রে স্থানে স্থানে তাঁহার অনুজ্ঞাপত্র ক্ষোদিত আছে, তাহাতে লোকের মঙ্গল সাধনার্থে যত্ন এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি উদার ভাব লক্ষিত হয়।

ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া আর কোনরূপ উপকার করেন নাই, এরূপ নহে। এতদ্দেশবাসিগণ সিংহল, যব ও বালিদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া তথায় সভ্যতার সূত্রপাত করেন। সিংহলের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল যে পালিভাষায় লিখিত, তাহা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত। সিংহলের রাজবংশ বাঙ্গালী। বালিদ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে ও তাহাদিগের পূজা হইয়া থাকে; এবং তথায় যে কবিভাষা প্রচলিত, তাহাও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে সিংহল ও ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণী হইতে অর্ণবপোতে মুক্তা ও দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতি লইয়া আসিয়া ভারতবর্ষীয়-

সেকেন্দ্রা।
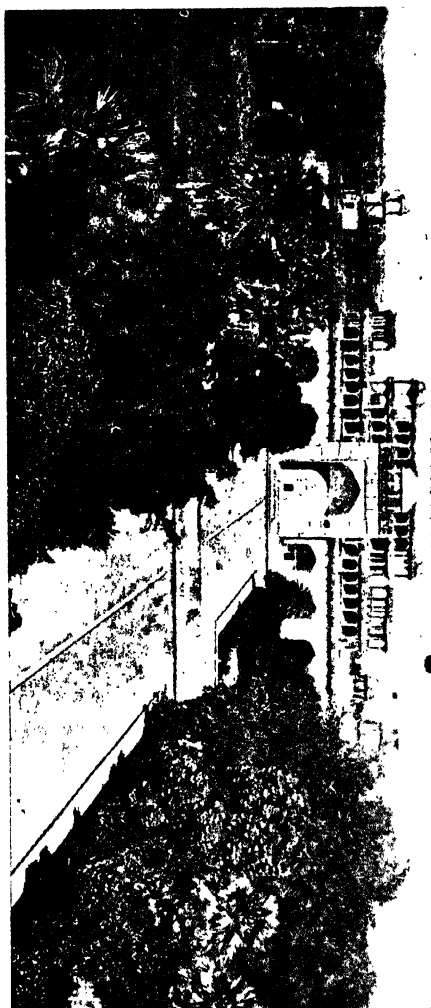
গণ পাশ্চাত্য দেশে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে তাঁহাদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুণে য়িহুদী, ফিনিসীয়, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি অনেক জাতি উপকৃত হইতেন। এক্ষণে সভ্যসমাজে যে কার্পাসবস্ত্রের বহুল ব্যবহার, তাহার উৎপত্তি ভারতবর্ষে। সকলেই স্বীকার করেন যে, কার্পাস শিল্পজাতের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। ঋগ্‌বেদে তন্ত্রস্থিত কার্পাস-বস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং তাদৃশ প্রাচীন কালেও এতদ্দেশে কার্পাস-বস্ত্র-ব্যবসায় প্রচলিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতিগণ যে ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে রেশমের কাপড় পাইতেন, তাহারও প্রমাণ আছে। রেশমের উৎপত্তি চীনেই হউক বা ভারতবর্ষেই হউক, ইউরোপের প্রাচীন সভ্য জাতিগণ যে এতদ্দেশ হইতে পট্টবস্ত্র প্রাপ্ত হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ বহুকাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্যজনপদের কার্পাস ও রেশমী কাপড় যোগাইত।

৺ চন্দ্রনাথ বসু।

যম।

[চন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সমালোচনায়। তবে সাধারণতঃ 'সমালোচক' বলিলে যাহা বুঝায়, চন্দ্রনাথ সে শ্রেণীর সমালোচক ছিলেন না। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতায় তিনি যাহা কিছু মহিমান্বিত ও গৌরবমণ্ডিত দেখিয়াছিলেন, তৎপ্রতি সর্ব্বসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করা তিনি নিজ কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন। এইরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই চন্দ্রনাথ, সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণাদিতে অঙ্কিত মানব-জীবনের আদর্শগুলির আলোচনা ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার 'শকুন্তলা-তত্ত্ব', 'সাবিত্রী-তত্ত্ব', 'হিন্দুত্ব' প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থ এই একই উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাঁহার 'সাবিত্রী-তত্ত্ব' হইতে গৃহীত হইল।

চন্দ্রনাথের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার আদর্শে গঠিত। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ন্যায় চন্দ্রনাথের রচনায় কাব্যামোদি-বাঞ্ছিত বৈচিত্র্য না থাকিলেও তাহাতে স্বাভাবিক লালিত্য ও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই।]

যমের যেমন দুর্নাম, ত্রিভুবনে তেমন আর কাহারো নাই। লোকে যমকে যেমন ভয় করে তেমন আর কাহাকেও করে না। লোকে বলিয়া থাকে—যমের মায়া-দয়া নাই, কৃপা-করুণা নাই, হৃদয়ের কোমলতা-কমনীয়তা নাই। যম নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, নির্ম্মম। যম কেবল মানুষ মারে—মায়ের কোল হইতে সন্তান কাড়িয়া লইয়া যায়, পত্নীর পার্শ্ব হইতে পতিকে অপহরণ করে, কনিষ্ঠকে লইয়া জ্যেষ্ঠকে কাঁদায়, জ্যেষ্ঠকে লইয়া

কনিষ্ঠকে পথের ভিখারী করে, বড় বড় বংশ নির্ব্বংশ করিয়া দেয়, বড় বড় গ্রাম, বড় বড় নগর, বড় বড় জনপদ উজাড় করিয়া দেয়। যমের জন্য ভগ্নহৃদয়, যমের জন্য ক্রন্দন, যমের জন্য হা-হুতাশ, যমের জন্য শোক-সন্তাপ। যমের মতন শত্রু মানুষের আর নাই। লোকে বলে, মানুষ মরিয়া যমালয়ে গিয়া অশেষ যন্ত্রণা পায়। শুনা যায়, কেহ কেহ মৃত্যু-মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গল্প করিয়াছে—যমালয়ে গিয়াছিলাম, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছিলাম, যম খাইতে দিল গোটা কতক নখ আর চারিটী ছেঁড়া চুল, পান করিতে দিল একটী ধোনের চালে করিয়া এক বিন্দু জল, এই দেখ, সেই নখ আর চুলগুলি আনিয়াছি। অনেকে নাকি দেখিয়াছেন, যমালয়-প্রত্যাগত রোগীর বস্ত্রের কোণে নখ ও ছেঁড়া চুল বাঁধা রহিয়াছে। যমযন্ত্রণা, যমের পীড়ন, যমের দাগাদারি—লোকমুখে এইরূপ কথা অষ্ট প্রহরই শুনা যায়। লোকের বিশ্বাস—যমের ন্যায় শত্রু মানুষের আর নাই, যমের ন্যায় নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, নির্ম্মম, পীড়নপ্রিয়, ধ্বংসকারী, সর্ব্বনাশকারী, ছারখারকারী আর কেহ নাই। এই জন্য লোকের সংস্কার—যমের মনও যেমন ভীষণ, মূর্ত্তিও তেমনি ভীষণ, অন্তরও যেমন কঠিন, আকারও তেমনি বিকট। এ সংস্কারের আরো হেতু আছে। জীব যখন যমের অধিকারে গিয়া পড়ে, তখন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে, বিষম বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া, তবে যায়। বিধাতার বিধানে সে যন্ত্রণা সকলকেই দেখিতে হয়, সে যন্ত্রণা দেখিয়া সকলকেই কাঁদিতে হয়,

অনেককেই বিহ্বল হইতে হয়, কেহ কেহ পাগল হইয়া যায়। আর কেবলই কি সেই যন্ত্রণা? আহা, কি পরিবর্ত্তন, কি বিকৃতি, কি পরিণাম! সোণার বর্ণ তখন কালী হইয়া যায়; বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু তখন প্রভাহীন কোটরগত; কোকিল কণ্ঠ তখন ছিন্ন, ছন্দোহীন, ভীতিজনক; অমিততেজঃসম্পন্ন মস্তিষ্ক তখন মহাপ্রলয়গ্রস্ত; অনুপম লাবণ্য-শোভা-সৌন্দর্য্য-কান্তি-কমনীয়তা-সমন্বিত নরদেহ তখন কঙ্কালমাত্র! যাহার অধিকারে যাইতে হইলে এই পরিণতি, এই বিকৃতি, এই পরিবর্ত্তন, তাহাকে যথার্থই অতি ভীষণ, অতি বিকটাকার মনে হইবার কথা—শুধু সামান্য লোকের মনে হইবার কথা নয়, মহাপুরুষদিগেরও মনে হইবার কথা। পুরাণকার, শাস্ত্রকার, মহাকবি সকলেই যমের বড় ভীষণ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। যমকে দেখিয়া, সাবিত্রীর ন্যায় নারীর হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠিয়াছিল ঃ—

অনন্তর সেই তপস্বিনী নারদের বাক্য চিন্তা করতঃ সেই মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, বেলা ও দিবস যোজনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং মুহূর্ত্তকাল পরেই দেখিতে পাইলেন, রক্তবস্ত্রপরিধায়ী, বদ্ধমুকুট, প্রশস্তকায় সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, শ্যামগৌরবর্ণ, লোহিতলোচন একজন ভয়ঙ্কর পুরুষ পাশ হস্তে লইয়া, সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহারে দেখিবামাত্র সাবিত্রী ধীরে ধীরে পতির মস্তকটী ভূতলে বিন্যস্ত করিয়া, সহসা উত্থানপূর্ব্বক কম্পমান হৃদয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে, কাতরভাবে, এই কথা বলিলেন।

নরকযন্ত্রণার তুল্য যন্ত্রণা কল্পনা করা অসম্ভব বলিলেই হয়। পুরাণে এই নরকযন্ত্রণার পূর্ণমাত্রারও অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে অসংখ্য নরক, অসংখ্য নরকে অসংখ্য প্রকার যন্ত্রণা বর্ণিত আছে। অসংখ্য যন্ত্রণাপূর্ণ অসংখ্য নরকের কথা পড়িতে পড়িতে অবসন্ন ও অভিভূত হইতে হয়। পাপীকে যমই সেই সকল নরকে নিক্ষেপ করেন। যম কর্ম্মফল-বিধাতা, তাঁহারই জন্য পাপীকে অসংখ্য নরকে, অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। লোকের তাঁহাকে অতি ভীষণ, অতি বিকটাকার মনে করিবার কথাই ত বটে। মহাকবি এবং পুরাণকারও যে তাঁহাকে ভয়ঙ্কর বিকটাকার পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও বিচিত্র নহে।

কিন্তু যে শাস্ত্রে ও সাহিত্যে যমের বাহ্য মূর্ত্তি এতই ভীষণ, সেই শাস্ত্রে এবং সেই সাহিত্যেই যমের আভ্যন্তরিক মূর্ত্তি বড়ই মহান্, মধুর, কমনীয়, করুণার্দ্র। কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে যম ব্রহ্মজ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার, ব্রহ্মবিদ্যার বিপুলতম আধারস্বরূপ প্রতীয়মান। আর মহাভারতকারের সাবিত্রীর উপাখ্যানে তাঁহাতে দেখি ধর্ম্মোন্মাদ এবং যে প্রীতি, স্নেহ, মায়া, মমতা, কৃপা, করুণা, দয়া, সৌজন্য, শিষ্টতা প্রভৃতি মায়াময় জীবজগতের জীবন বা প্রাণস্বরূপ, তাহারই অতি রমণীয় অচিন্তিতপূর্ব্ব বিকাশ।

যমের কাছে ধার্ম্মিকের অসীম মর্য্যাদা। যম সত্যবান্‌কে লইতে আসিবামাত্র সাবিত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

আপনি কে এবং কি নিমিত্ত আসিয়াছেন?

যম কি উত্তর দিলেন, শুনুন—

সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠানসমন্বিতা; এই নিমিত্ত আমি তোমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছি।

সাবিত্রী ধার্ম্মিকা না হইলে, যম তাঁহার সহিত কথা কহিতেন না। যিনি ধার্ম্মিক, যমের কাছে তাঁহার কত সম্মান, যমের তাঁহার উপর কত অনুগ্রহ, সাবিত্রী-উপাখ্যানে তাহা অতি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। কিন্তু যমের নিকট ধার্ম্মিকের মর্য্যাদার ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ ঐ উপাখ্যানেই আছে। সাবিত্রী যমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

মৃতব্যক্তিকে লইয়া যাইবার জন্য আপনার দূতদিগকে পাঠাইয়া থাকেন, আমার পতিকে লইয়া যাইবার জন্য আপনি স্বয়ং আসিয়াছেন কেন?

যমের উত্তর শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়—

এই সত্যবান্ ধর্ম্মসংযুক্ত, রূপবান্ ও গুণসাগর, সুতরাং আমার দূতগণ কর্ত্তৃক নীত হইবার যোগ্য নহেন; এই নিমিত্তই আমি স্বয়ং আসিয়াছি।

সত্যবান্ ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মফলবিধাতা স্বয়ং ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন; নহিলে ধর্ম্মের অবমাননা হয়, ধার্ম্মিকের অমর্য্যাদা হয়। যমের উদারতা, মহত্ত্ব, মহানুভবতায় মোহিত হইতে হয়।

আমরা বলি—যম নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, পাষাণহৃদয়। কিন্তু

যমের অন্তঃকরণ কি কোমল দেখ দেখি! যমের নিকট প্রথম বর লাভ করিয়াও যখন সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন, তখন,—

"তোমার যতদূর আসা সম্ভব, তুমি ততদূর আসিয়াছ"—

এই বলিয়া যম তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু না ফিরিয়া আর একটী বর লাভ করিয়া, তিনি আবার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। তখন যম তাঁহাকে বলিলেন—

এত পথ আসিয়া তুমি যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, অতএব আর আসিও না, ফিরিয়া যাও, আরো আসিলে আরো ক্লান্ত হইবে।

ইহা কেবল ধার্ম্মিকের প্রতি ধর্ম্মের সম্মান ও সহানুভূতির কথা নহে। ইহা হৃদয়ের কথা—স্নেহের কথা—করুণার কথা—বড় কোমল প্রাণের কোমল কথা। যম নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, পাষাণ-হৃদয় নহেন। তাঁহার হৃদয় বড় কোমল, তিনি বড় স্নেহ-ময়, তাঁহার অপূর্ব্ব করুণা। যতবার সাবিত্রী বর লাভ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছেন, তত বারই তিনি তাঁহাকে পরি-শ্রান্তা দেখিয়া এমনি কাতর হইয়া, এমনি মধুর, এমনি করুণাপূর্ণ, এমনি স্নেহমাখা বাক্যে তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন।

তুমি অনেক পথ আসিয়াছ, আর আসিও না, ফিরিয়া যাও, আরো আসিলে আরো ক্লান্ত হইয়া পড়িবে—

সেই মহারাত্রে সেই মহাগভীর মহারণ্যের মধ্যে কে থাকিয়া থাকিয়া এই মায়াময়, মোহময়, মধুময় কথা কহিয়াছিল?

কাহাকেই বা কহিয়াছিল ? ধর্ম্মরাজ যম কহিয়াছিলেন ধর্ম্ম-স্বরূপিণী সাবিত্রীকে। যেখানে ধর্ম্ম, যমের সেখানে এমনি স্নেহ, এমনি মায়া, এমনি মোহ, এমনি করুণা। যম নিষ্ঠুর, যম নির্দ্দয়, যম নির্ম্মম—এ কথা বলিতে নাই—মনেও করিতে নাই। একথা বলিলেও পাপ, মনে করিলেও পাপ।

ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে নিয়তি। ধর্ম্মরাজ যম সেই নিয়তি রক্ষা করেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতে দেন না। বিবাহের এক বৎসর পরে মরিবেন, সত্যবান্ এই নিয়তি লইয়া, দ্যুমৎসেন-গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিয়তি অনুসারে সত্যবানের মৃত্যু ঘটিল—যমও তদ্দণ্ডে তাঁহাকে লইতে আসিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল না। কেন হইল না ? তিনি যেমন সত্যবান্‌কে লইলেন, অমনি সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গে যাইতে যাইতে তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মকথা শুনিয়া, অহ্লাদিত হইয়া সাবিত্রীকে একটি বর দিলেন—বর দিয়া সত্যবান্‌কে লইয়া আবার যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না, ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে আবার গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধর্ম্মরাজ যত ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার উল্লাস ততই বাড়িতে লাগিল —তিনি একটী, দুইটী, করিয়া তিনটী বর দিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তখনও সত্যবানের নিয়তির কথা ভুলেন নাই—তখনও সাবিত্রীকে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। কিন্তু সাবিত্রী ফিরিলেন না—আবার ধর্ম্মকথা কহিলেন। যম বলিলেন– এমন কথা আমি আর কাহারও কাছে শুনি নাই।

তিনি সাবিত্রীকে আবার বর দিতে চাহিলেন। সাবিত্রী শত পুত্রের প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মরাজ তখন উল্লাসে উন্মত্ত, সত্যবানের কথা, সত্যবানের নিয়তির কথা, সব ভুলিয়া গিয়াছেন, বলিয়া ফেলিলেন—তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ধর্ম্মোল্লাসে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মরূপিণী সাবিত্রীর বৈধব্যনিয়তি উড়াইয়া দিলেন। ধার্ম্মিকের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া মহানিয়তি উড়াইয়া দেন—এ কেমন যম, বল দেখি। এ যমকে দেখিয়া উল্লাসে উন্মত্ত না হইয়া থাকা যায় কি ?

সাবিত্রীকে স্বামী ফিরাইয়া দিয়াই যম ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। মনের উল্লাসে তাহাকে কতকগুলি আশীর্ব্বচনে প্রীত করিয়া গিয়াছিলেন—

ভদ্রে! আমি তোমার স্বামীকে এই মুক্ত করিয়া দিলাম; হে কুলনন্দিনি! তুমি স্বচ্ছন্দে ইঁহারে লইয়া যাইতে পারিবে। এই সত্যবান্ রোগমুক্ত ও সিদ্ধার্থ হইবেন, তোমার সহিত চারি শত বৎসর পরমায়ু লাভ করিবেন, ধর্ম্মসহকারে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, লোকে খ্যাতি প্রাপ্ত হইবেন। তোমার পুত্রেরাও সকলে পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ও রাজা হইবে এবং পৃথিবীতে চিরকাল তোমার নাম বিখ্যাত হইয়া থাকিবে। তোমার পিতারও একশত পুত্র হইবে এবং তোমার সেই দেবতুল্য ক্ষত্রিয় সহোদরেরাও পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হইয়া, মালব নামে বিখ্যাত থাকিবে।

যমের ধর্ম্মোন্মাদ, যমের দয়া, কৃপা, করুণা, কোমলতা, কমনীয়তা, শুভানুধ্যায়িতা দেখিয়া অভিভূত হইতে হয়।

যমের বহির্মূর্ত্তি সত্য সত্যই বড় ভয়ানক। যে মরে সে বড়ই ভয় দেখাইয়া, দুঃখ দিয়া, মর্ম্মস্থল ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়া মরে। কিন্তু যমের অন্তর্মূর্ত্তি বড়ই মহান্, বড়ই রমণীয়। ধর্ম্মবল ব্যতীত সে মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। ধার্ম্মিকের চক্ষে যম সর্ব্বকল্যাণদাতা, সর্ব্ববিপদ-সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশক—অতীব সুন্দর। যিনি ধার্ম্মিক তিনি যমে বা মৃত্যুতে ভয়বিভীষিকা না দেখিয়া, পরম রমণীয়তাই দেখিয়া থাকেন এবং যম বা মৃত্যু হইতে পরম কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। যম বা মৃত্যুর সাহায্যেই ধার্ম্মিক জগতের নিম্ন স্তর হইতে উচ্চ স্তরে আরোহণ করেন, মৃতেরা জীবন লাভ করিয়া থাকে। মৃত্যুর উপরই জীবনের প্রতিষ্ঠা। ধার্ম্মিকেরা ইহাও বুঝিয়া থাকেন যে, যমের ভীষণতা, নিষ্ঠুরতা, নির্ম্মমতা—সকলই অধার্ম্মিকের মনের বিভীষিকা, অধর্ম্মনাশার্থ প্রকৃতিপ্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্র—সুতরাং কল্যাণকামনামূলক, পরম কল্যাণপ্রদ।

৺রজনীকান্ত গুপ্ত।

হিউএনথ্ সঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

[বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে বঙ্গভাষার লেখকগণের প্রতিভা নানা দিকে বিসৃত হইয়া অতিশয় সন্তোষজনক ফল প্রসব করিয়া থাকিলেও, বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাসের দিক্‌টা তত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে নাই। কয়েকখানা বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাস এবং স্বল্পসংখ্যক প্রকৃত ও অনেকগুলি তথা-কথিত ঐতিহাসিক উপন্যাস ব্যতীত ইতিবৃত্তবিষয়ক গ্রন্থ অল্পই রচিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে কয়জন প্রতিভাবান্ লেখক মৌলিক অনুসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের এই শোচনীয় অভাব পূরণে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রজনীকান্তের স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' বাঙ্গালা ভাষায় এক অমূল্য গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতর ঐতিহাসিক সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা গম্ভীর, বিশুদ্ধ, ওজোগুণসম্পন্ন ও স্থলে স্থলে জ্বালাময় আবেগপূর্ণ।

স্বনামখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএনথ্ সঙ্গ্ ৬০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই চীনদেশীয় বৌদ্ধ শ্রমণগণ গৌতমবুদ্ধের জন্মভূমিদর্শন-মানসে ভারতবর্ষে আগমন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় আগ্রহান্বিত হয়েন। যাঁহাদের আগ্রহ সফল হইয়াছিল, তন্মধ্যে পরিব্রাজকপ্রবর ফা-হিয়ানের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু একাগ্রতা, অধ্যবসায়, বিচারশক্তি প্রভৃতি গুণে হিউএন্থ্ সঙ্গ্ই চীনদেশীয় পর্য্যটকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি দীর্ঘকাল এদেশে থাকিয়া বহুসংখ্যক শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ও ভারতবর্ষ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বদেশীয় জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধিকল্পে আপনার অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করেন।]

খ্রীঃ ৬২৯ অব্দে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে, হিউএন্থ্ সঙ্গ্ বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণপূর্ব্বক ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম পীত নদীর (হোয়াং হো) তীরে সমাগত হইলেন। এই স্থানে ভারতবর্ষযাত্রিগণ একত্র হইয়া থাকে। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা সকলকে রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিউএন্থ্ সঙ্গ্ ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধদিগের সাহায্যে, শান্তিরক্ষকগণের অজ্ঞাতসারে যাত্রা করিলেন। এ পর্য্যন্ত দুই জন বন্ধু তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। এই বন্ধুদ্বয়ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। হিউএন্থ্ সঙ্গ্ পরিচালকবিহীন ও বন্ধুবিহীন হইলেন। তিনি ভক্তিভাবে উপাসনা করিয়া, আপনার বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে এক ব্যক্তি তাঁহার পথপ্রদর্শক হইতে সম্মত হইল। হিউএন্থ্ সঙ্গ্ ইহার সঙ্গে নিরাপদে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শেষে এই পথপ্রদর্শকও মরুভূমির নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। এখনও পাঁচটি রক্ষিগৃহ অতিক্রম করা বাকী ছিল। প্রতি রক্ষিগৃহে রক্ষিগণ সর্ব্বদা পাহারা দিত। এ দিকে সুবিস্তৃত মরুভূমিতে অশ্বের পদচিহ্ন বা মৃতজীবের কঙ্কাল ব্যতীত পথজ্ঞাপক অন্য কোন নিদর্শন ছিল না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিউএন্থ্ সঙ্গ্ বিচলিত হইলেন না। তিনি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াও, ধীরভাবে প্রথম রক্ষিগৃহের নিকটে উপনীত হইলেন। এই স্থানে রক্ষিবর্গের নিক্ষিপ্ত বাণে তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইত; কিন্তু এক জন ধর্ম্মনিষ্ঠ

বৌদ্ধ এই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সাহসী তীর্থযাত্রীকে ছাড়িয়া দিতে কহিলেন, অন্যান্য রক্ষিগৃহে উপস্থিত হইতে ইঁহার কোন অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য তত্রত্য অধ্যক্ষদিগের নামে এক খানি পত্র লিখিয়া দিলেন। হিউএন্‌থ্ সঙ্গ্ রক্ষিগৃহ-সমূহ অতিক্রম করিয়া, আর একটী মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই স্থানে তিনি পথহারা হইয়া পড়িলেন। এদিকে তিনি যে চর্ম্মভাণ্ডে জল আনিতেছিলেন, উহা হঠাৎ ফাটিয়া গেল। হিউএন্‌থ্ সঙ্গ্ পথহারা হইয়া সেই মরুভূমিতে জলের অভাবে নিরতিশয় কষ্টে পরিলেন। তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় এতক্ষণে বিচলিতপ্রায় হইল। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল। অকস্মাৎ যেন কোন অভাবনীয় শক্তিতে তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় বর্দ্ধিত হইল। হিউএন্‌থ্ সঙ্গ্ মনে মনে কহিলেন, "আমি শপথ করিয়াছি, যাবৎ ভারতবর্ষে উপনীত না হই, তাবৎ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। তবে কেন আমার এমন দুর্ম্মতি হইল? কেন আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম? পশ্চিমে যাইতে প্রাণ যায়, তাহাও ভাল; তথাপি জীবিত অবস্থায় পূর্ব্ব দিকে ফিরিব না!" হিউ এন্‌থ্ সঙ্গ্ আবার পশ্চিম দিকে ফিরিলেন, এবং এক বিন্দু জল পান না করিয়া, চারি দিন পাঁচ রাত্রি, সেই ভয়ঙ্কর মরুভূমি দিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে কেবল পবিত্র ধর্ম্ম পুস্তক হইতে উপদেশ সমুহের আবৃত্তিপূর্ব্বক হৃদয়ের শান্তিসম্পাদন করিতেন। তরুণবয়স্ক ধর্ম্মব্রতীর এইরূপে কেবল

ধর্ম্মোপদেশে বলীয়ান্ হইয়া একটী বৃহৎ হ্রদের তটে উপস্থিত হইলেন। এই জনপদ তাতারদিগের অধিকৃত। তাতারগণ হিউএন্থ্ সঙ্গ্‌কে সাদরে গ্রহণ করিল। একজন তাতার ভূপতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি হিউএন্থ সঙ্গ্‌কে প্রজালোকের ধর্ম্মোপদেষ্টা করিয়া রাখিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। হিউএন্থ্ সঙ্গ্ ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাতার ভূপতি শেষে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন কিন্তু হিউএন্থ্ সঙ্গের হৃদয় বিচলিত হইল না। তাতার ভূপতি এই দরিদ্র যতিকে আপনার মতে আনিবার জন্য, অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; অবশেষে তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। হিউএন্থ্ সঙ্গ্ অনুচরগণের সহিত অনেকগুলি তুষারমণ্ডিত দুর্গম গিরি অতিক্রমপূর্ব্বক বাক্ত্রিয়া ও কাবুলিস্থান দিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হয়েন। এই সকল তুষারসমাচ্ছাদিত পর্ব্বতশ্রেণী লঙ্ঘন করিতে সাত দিন লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে তাঁহার চৌদ্দ জন অনুচর বিনষ্ট হয়।

হিউএন্থ্ সঙ্গ্ মধ্য এশিয়ায় সভ্যতার উন্নতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়েন। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। লোকে স্বর্ণময়, রৌপ্যময় ও তাম্রময় মুদ্রা ব্যবহার করিত। স্থানে স্থানে বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল মঠে বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তকসমূহের অধ্যাপনা হইত। কৃষিকার্য্যের অবস্থা ভাল ছিল। ধান্য, যব, আঙ্গুর প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে

বারাণসী
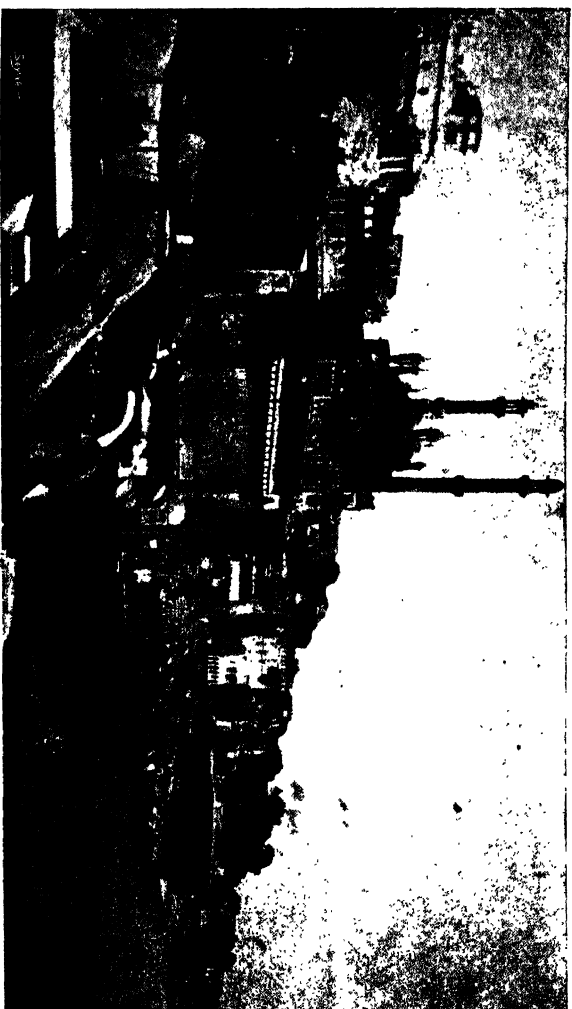
উৎপন্ন হইত। অধিবাসিগণ রেশম ও পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিত। প্রধান প্রধান নগরে সঙ্গীতব্যবসায়ীরা গানবাদ্যে আসক্ত থাকিত। এই জনপদে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল; স্থানে স্থানে অগ্নির উপাসনাও হইত। প্রাচীন সময়ে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগর যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার প্রধান স্থান বলিয়া সমগ্র ইউরোপে সম্মানিত হইত, উক্ত সময়ে মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ নগরেরও সেইরূপ প্রতিপত্তি ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণ সমরখন্দবাসীদিগের আচারব্যবহারের অনুকরণ করিত। বিষয়প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে মধ্য এশিয়ার অবস্থা এই স্থানে বর্ণিত হইল। হিউএন্‌থ্ সঙ্ যে স্থানে গিয়াছেন, যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তৎসমুদয়ের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানের গভীরতায়, ভাবের উচ্চতায় ও বর্ণনার প্রাঞ্জলতায়, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অতি উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়াতে ঐতিহাসিক ক্ষেত্র অভিনব জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

হিউএন্‌থ্ সঙ্ মধ্য এশিয়া হইতে কাবুল দিয়া, পুরুষপুরে (পেশাবরে) উপনীত হয়েন, এবং ঐ স্থান হইতে কাশ্মীরে গমন করেন। ইহার পর তিনি পাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে মগধে উপস্থিত হয়েন। এতদিনে এই অধ্যবসায়সম্পন্ন ধর্ম্মবীরের বাসনা ফলবতী হয়। বিদেশী ধর্ম্মবীর আপনাদের পবিত্র তীর্থ——কপিলবাস্তু, শ্রাবস্তী, বারাণসী, বুদ্ধগয়া দর্শন করিলেন, মধ্য ভারতবর্ষের অনেক স্থান দেখিলেন, বাঙ্গালায় যাইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থার সন্ধান লইলেন, দক্ষিণাপথে পরি-

ভ্রমণপূর্ব্বক ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহ করিলেন; একে একে ভারত-বর্ষের প্রায় সমুদয় প্রধান স্থান তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া, এবং প্রধান প্রধান সংস্কৃত ও বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া, ক্রমে জ্ঞানী ও বহুদর্শী হইলেন। সহায়সম্পন্ন লোকে যাহা করিতে পারে নাই, একটী অসহায়, বিদেশী, দরিদ্র যুবক আপনার সাহস ও উদ্যম, সর্ব্বোপরি আপনার অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠায় তাহা সম্পন্ন করিলেন। দক্ষিণাপথ হইতে হিউএন্‌থ্‌ সঙ্‌ সিংহল দ্বীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন, কিন্তু কাঞ্চীপুরে (কঞ্চিবিরমে) গিয়া শুনিলেন, সিংহল দ্বীপ অন্তঃসংগ্রামে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য তিনি সিংহলে গেলেন না। কঞ্চিবিরম হইতে করমণ্ডল উপকূল দিয়া কিয়দ্দূর গিয়া, মলবার উপকূলে উপনীত হইলেন। সেই স্থান হইতে সিন্ধুর প্রসন্নসলিলসিক্ত পঞ্চনদে গমন করিলেন, এবং ক্রমে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের প্রধান প্রধান নগর দর্শন করিয়া, মগধে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হিউএন্‌থ্‌ সঙ্‌ এই স্থানে তাঁহার সদাশয় বন্ধুগণের সহিত কিছু দিন একত্র বাসপূর্ব্বক সাতিশয় প্রীতিলাভ করেন। ইহার পর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি পাঞ্জাব ও কাবুলিস্থান দিয়া, মধ্য এশিয়ার উন্নত ভূখণ্ডে উপনীত হইলেন এবং তুর্কিস্থান, কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোতান নগরে কিছুকাল থাকিয়া, ষোল বৎসর কাল ভ্রমণ, অধ্যয়ন ও বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রামের পর খ্রীঃ ৬৪৫ অব্দের বসন্তকালে গরীয়সী জন্মভূমিতে পদার্পণ করিলেন।

এইরূপে সদাশয় ধর্ম্মবীরের ভ্রমণকার্য্য সমাপ্ত হইলে, এইরূপে সদাশয় ধর্ম্মবীর গৌরবশ্রীতে অলঙ্কৃত হইয়া, দীর্ঘকালের পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্রাট্ প্রতিপত্তিশালী, দরিদ্র পরিব্রাজকের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। চীনের রাজধানীতে তাঁহার প্রবেশসময়ে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রাজপথ কার্পেটে আচ্ছাদিত হইল। উহার উপর সুগন্ধি পুষ্পগুচ্ছ শোভাবিকাশ করিতে লাগিল। স্থানে স্থানে জয়পতাকাসমূহ বায়ুভরে প্রকম্পিত হইতে লাগিল। সৈনিক পুরুষগণ পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। প্রধান রাজপুরুষগণ বিখ্যাত পরিব্রাজককে অভিনন্দন করিয়া আনিতে গেলেন। দরিদ্র ধর্ম্মবীর আপনার কৃতকার্য্যের গৌরবে উন্নত হইলেও, বিনম্রভাবে এই মহোৎসবের মধ্যে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। হিউএন্থ্ সঙ্গ্ বুদ্ধের স্বর্ণময়, রৌপ্যময় ও চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি এবং ৬৫৭ খানি গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সম্রাট্ ইহাতে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া, সুসজ্জিত প্রাসাদে যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তদীয় বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও গুণের প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে সাম্রাজ্যের একটী প্রধান কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হিউএন্থ্ সঙ্গ বিনীতভাবে ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, বুদ্ধের জীবনী ও নিয়মাবলীর পর্য্যালোচনায় জীবিতকালের অবশিষ্ট ভাগ

যাপন করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। সম্রাট্ অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার জন্য একটি মঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই স্থানে তিনি অপরাপর বৌদ্ধ পুরোহিতের সহিত পুস্তকসমূহের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত শীঘ্র লিখিত ও প্রকাশিত হইল। কিন্তু সংস্কৃত পুঁথিসমূহের অনুবাদে অনেক দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। কথিত আছে, হিউএন্থ্ সঙ্গ্ বহুসংখ্য সহযোগীর সাহায্যে ৭৪০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই সকল গ্রন্থ ১,৩৩৫ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল। অনুবাদসময়ে তিনি প্রায়ই গ্রন্থের দুরূহ অংশের অর্থপরিগ্রহের জন্য নির্জ্জন স্থানে চিন্তা করিতেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল হঠাৎ প্রসন্ন হইত, হঠাৎ যেন কোন অচিন্ত্যপূর্ব্ব আলোকে তাঁহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। অন্ধকারময় স্থানে পরিভ্রমণসময়ে পথিক সহসা সূর্য্যের আলোক পাইলে যেমন প্রফুল্ল হয়, হিউএন্থ্ সঙ্গ্ চিন্তা করিতে করিতে দুরূহ অংশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া, সেইরূপ প্রফুল্ল হইতেন।

এইরূপে ধর্ম্মচিন্তা, গ্রন্থপ্রণয়ন ও গ্রন্থপ্রচার করিয়া, হিউএন্থ্ সঙ্গ্ ক্রমে জীবিতকালের চরমসীমায় উপনীত হইলেন। তিনি মৃত্যুকালে স্বকীয় সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন, এবং আত্মীয় ও বন্ধুদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের নিকটে বিদায় লইলেন। অন্তিম সময়েও তাহার প্রসন্ন ভাবের কোন ব্যত্যয় হইল না। তিনি প্রশান্তভাবে কহিলেন, "সৎকার্য্যপ্রযুক্ত আমি যে কিছু প্রশংসা পাইতে

পারি; তাহা কেবল আমার নিজের প্রাপ্য নয়, অপরাপর লোকেও উহার অংশ পাইবার যোগ্য।” খ্রীঃ ৬৬৪ অব্দে হিউএন্থ্ সঙ্গের দেহত্যাগ হয়।

হিউ এন্থ্ সঙ্গের সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয় ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল। হিন্দু দেবমন্দিরের পার্শ্বে বৌদ্ধমঠ স্বকীয় গৌরব রক্ষা করিতেছিল। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়েই নিরাপদে ও নিরুদ্বেগে আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। হিউএন্থ্ সঙ্গ্ যে পথে ভারতবর্ষে উপনীত হয়েন, সে পথের পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থা উন্নত ছিল। কপিশা রাজ্যে (বর্ত্তমান কাবুলিস্থান) এক জন ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। এই স্থানে একশতটি মঠে ছয় হাজার শ্রমণ থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্য দেবমন্দির ছিল। সন্নাসিগণ কেহ উলঙ্গ অবস্থায় থাকিত, কেহ সমস্ত দেহে ভস্ম মাখিত, কেহ বা অলঙ্কারের ন্যায় কপালসমূহ ধারণ করিত। পেশাবর কপিশারাজ্যের অধীন ছিল। এই স্থানে মহারাজ অশোক ও কনিষ্কের নির্ম্মিত বহুসংখ্য ভগ্নমঠ কালের অনন্ত শক্তির পরিচয় দিতেছিল। কাশ্মীরের রাজা হিন্দুধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন, সুতরাং এই রাজ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। থানেশ্বর ও মথুরায় হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও প্রাদুর্ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছিল। হিউএন্থ্ সঙ্গ্ কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ক্ষত্রবীরগণের বৃহদাকার কঙ্কাল সমূহ দেখিয়া, বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কান্যকুব্জ রাজ্য সমৃদ্ধ ছিল।

হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য এই স্থানের অধিপতি ছিলেন। ভারতের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক রাজ্যে তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীন হয়। ভারতবর্ষে আঠার জন রাজা তাঁহার করদ হয়েন। মহারাষ্ট্ররাজ দ্বিতীয় পুলকেশী ব্যতীত সাহসে ও পরাক্রমে ভারতবর্ষে শীলাদিত্যের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। মহারাজ শীলাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান পরিপোষক ছিলেন। তিনি এই ধর্ম্মের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করেন। অযোধ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। প্রয়াগে হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রাবস্তীতে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমে অবনতি হইতেছিল। হিউএন্‌থ সঙ্গ্‌ বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবাস্তুর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া দুঃখিত হয়েন। বুদ্ধ, বারাণসী প্রভৃতি যে কয়েকটি নগরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছিল। বৈশালী ভগ্নদশাপন্ন এবং উহার মঠ জনশূন্য ছিল। মগধের পঞ্চাশটি মঠে দশ সহস্র শ্রমণ বাস করিতেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের বহুসংখ্য দেবমন্দির ছিল। এক সময়ে যে প্রাচীন পাটলীপুত্রের সমৃদ্ধির মহিমায় ভারতবর্ষের সমগ্র রাজ্য অধঃকৃত হইয়াছিল, কালের কঠোর আক্রমণে এই সময়ে উহার পূর্ব্বগৌরব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উহার বহুসংখ্য অট্টালিকা ও মঠের ভগ্নাবশেষ প্রায় চৌদ্দ মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছিল। হিউএন্‌থ্‌ সঙ্গ্‌ যখন বুদ্ধগয়ায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন নালন্দায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েন। নালন্দা গয়ার নিকটবর্ত্তী। কেহ কেহ বর্ত্তমান বড়গাঁওকে

প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, নালন্দা বৌদ্ধদিগের পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই স্থানে একটী আম্রকানন ছিল। কোন ধনাঢ্য বণিক্ উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ ঐ আম্রকাননে অনেক দিন যাপন করিয়াছিলেন। ক্রমে উক্ত স্থানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধ নৃপতি-গণের দানশীলতায়, ক্রমে এই বিদ্যামন্দির সম্প্রসারিত হইয়া উঠে। নালন্দার বিদ্যালয় এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্ব-প্রধান বৌদ্ধবিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদিগের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দশ হাজার শ্রমণ এই স্থানে থাকিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসাবিদ্যার আলোচনা করিতেন। মনোহর বৃক্ষবাটিকায় এই মহাবিদ্যালয় পরিশোভিত ছিল। ছয়টি চারিতল বৃহৎ অট্টালিকায় শিক্ষার্থি-গণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য একশতটি গৃহ ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞদিগের পরস্পর সম্মিলনের জন্য মধ্যস্থানে অনেকগুলি বড় বড় ঘর সুসজ্জিত থাকিত। মহারাজ শীলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। নগরের কোলাহল ঐ স্থানের শান্তিভঙ্গ করিত না, সাংসারিক প্রলোভনে উহার পবিত্রতানাশে সমর্থ হইত না। শিক্ষার্থিগণ ঐ শান্তিনিকেতনে প্রশান্তভাবে শাস্ত্রচিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। নালন্দার বিদ্যালয় কেবল বাহ্যসৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না, শাস্ত্রানুশীলনের প্রধান স্থান হওয়াতে

উহা ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উহার শিক্ষকগণ শাস্ত্রজ্ঞানে ও দূরদর্শিতায় ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ ছিলেন, উহার শিক্ষার্থিগণ শাস্ত্রালোচনায় ও শাস্ত্রচিন্তায় ভারতবর্ষে প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দিরের প্রধান অধ্যাপকের নাম শীলভদ্র। ইনি কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া, লোকের নিকট সম্মানিত ছিলেন। প্রায় সমগ্র শাস্ত্রই ইঁহার আয়ত্ত ছিল। অসামান্য ধর্ম্মশীলতায়, অসামান্য অভিজ্ঞতায় এবং অসামান্য দূরদর্শিতায় এই বর্ষীয়ান্ পুরুষ নালন্দার মহাবিদ্যালয় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

হিউএন্থ্ সঙ্গ্ ভারতীয় এই লীলাভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত হয়েন। তিনি অভিজ্ঞতাসংগ্রহ-মানসে যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া, ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহা শ্রমণদিগের অবিদিত ছিল না। নালন্দার শ্রমণগণ এই প্রসিদ্ধ পরিব্রাজকের পরিচয় লইতে সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা হিউএন্থ্ সঙ্গ্‌কে আদরসহকারে আহ্বান করিলেন। চারি জন অভিজ্ঞ শ্রমণ নিমন্ত্রণপত্র লইয়া, হিউএন্থ্ সঙ্গের নিকটে উপস্থিত হইলেন। হিউএন্থ্ সঙ্গ্ বিনম্রভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নালন্দায় উপস্থিত হইলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশসময়ে দুই শত জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণ আপনাদের প্রসিদ্ধ অতিথির যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। ইঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে বহুসংখ্য বৌদ্ধ, কেহ ছত্র ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ সুগন্ধি পুষ্পসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া, কেহ বা গম্ভীরস্বরে অতিথির প্রশংসাগীতি গাইয়া, তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া

তুলিলেন। এইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া, হিউএন্‌থ্‌ সঙ্গ্‌ সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষের নিকটে উপনীত হইলেন। শীলভদ্র বেদীতে বসিয়াছিলেন; হিউএন্‌থ্‌ সঙ্গ্‌ বেদীর নিকটে গিয়া, বিনম্রভাবে বর্ষীয়ান্‌ পুরুষের অভিবাদন করিলেন। এই অবধি হিউএন্‌থ্‌ সঙ্গ্‌ শীলভদ্রের শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত হয়েন। বিদ্যালয়ের একটি উৎকৃষ্ট গৃহে তাঁহাকে স্থান দেওয়া হয়। দশ জন শ্রমণ নিয়ত তাঁহার শুশ্রূষার জন্য নিয়োজিত থাকেন। মহারাজ শীলাদিত্য তাঁহার দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। হিউএন্‌থ্‌ সঙ্গ্‌ এইরূপে সকলের আদরণীয় হইয়া পাঁচ বৎসর, নালন্দার বিদ্যালয়ে ছিলেন, পাঁচ বৎসর, মহাপ্রাজ্ঞ শীলভদ্রের পদতলে বসিয়া, পাণিনির ব্যাকরণ, বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ ও ব্রাহ্মণদিগের প্রায় সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

হিউএন্‌থ্‌ সঙ্গ্‌ নালন্দা হইতে বাঙ্গালা, দক্ষিণাপথ ও মধ্যভারতবর্ষে গমন করেন। বাঙ্গালা প্রভৃতি জনপদের কোথাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য, কোথাও বা বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি লক্ষিত হয়। আসামে হিন্দুধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। এই স্থানের অধিপতির নাম ভাস্কর বর্ম্মা। ইনি 'কুমার' বলিয়াই প্রসিদ্ধ। বোধহয় 'কুমার' ইঁহার উপাধি ছিল। যাহা হউক, ভাস্কর বর্ম্মা শীলাদিত্যের মিত্র ছিলেন। তাম্রলিপ্ত (তমোলুক) একটি প্রধান বন্দর ছিল। হিউএন্‌থ্‌ সঙ্গ্‌ এই স্থানে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া, বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্ররাজ্য সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

মারাঠাদিগের প্রায় অর্দ্ধাংশ বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। ক্ষত্রিয়রাজ দ্বিতীয় পুলকেশী এই সময়ে মহারাষ্ট্রে আধিপত্য করিতেন। ইনি যেমন উদারস্বভাব সেইরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার দানশক্তির অবধি ছিল না। প্রজারঞ্জনগুণে ইনি সাধারণের অতিশয় প্রিয় হইয়াছিলেন। প্রকৃতিবর্গ কায়মনোবাক্যে ইঁহার আদেশপালন করিত। মহারাজ শীলাদিত্য অনেক স্থানে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন, কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্ররাজ পুলকেশীকে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

হিউএন্থ্ সঙ্গ্ ভারতবর্ষীয়দিগের সরলতা ও সাধুতার প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়গণ প্রবঞ্চনা বা কোন বিষয়ের জাল করিত না। তাহারা শপথ দ্বারা আপনাদের প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করিত এবং কোনরূপ পাপ করিলে, পরলোকে কঠোর শাস্তি-ভোগের আশঙ্কায় ভীত থাকিত। তাহাদের আচার-ব্যবহার সরল ও ভদ্র, তাহাদের স্বভাব শান্ত ও নম্র ছিল। হিন্দুদিগের বিচারকার্য্য সাতিশয় সরলভাবে সম্পন্ন হইত। যাহারা ন্যায়ের অন্যথাচরণ করিত, বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হইত, কিংবা মাতা-পিতার প্রতি কর্ত্তব্যসম্পাদনে ঔদাস্য দেখাইত, তাহাদের হস্তপদ বা নাসাকর্ণের ছেদন হইত। যদি অপরাধী সরলভাবে আপনার দোষ স্বীকার করিত তাহা হইলে তাহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ড বিহিত হইত। কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া, আত্মদোষগোপন করিত, তাহা হইলে উত্তপ্ত জল, অগ্নি, গুরুতর ভার বা বিষ-প্রয়োগ দ্বারা তাহার দোষাদোষ নির্দ্ধারিত হইত।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদ্যাসাগরচরিত্রের বিশেষত্ব।

[প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের পর এ পর্য্যন্ত আর কোনও বঙ্গীয় কবি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এত অধিকসংখ্যক মধুর, ভাবোজ্জ্বল ও প্রাণ-স্পর্শী গীতি-কবিতা রচনা করেন নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা যে কেবল কবিতায়ই স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নহে, তিনি গদ্যেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প, কয়েক খানা উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস ও নানাবিষয়িণী প্রবন্ধমালা রচনা করিয়া বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যকে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার ভাষার ন্যায় তাঁহার গদ্যও মধুর, কোমল ও কমনীয়। তাঁহার রচনায় অতি বিচিত্র ভাবপূর্ণতা দৃষ্ট হয় ; কিন্তু এই ভাববৈচিত্র্য এবং তাঁহার কবি-জনোচিত কলানৈপুণ্য স্থানে স্থানে তাঁহার রচনাকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোধ করিয়াছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের ভাষার যাহা বিশেষত্ব তাহা তাঁহার ন্যায় কল্পনাকুশল কবিরই উপযুক্ত ; কলানৈপুণ্যহীন ভাবদরিদ্র লেখকের পক্ষে সর্ব্বাংশে তাহার অনুকরণ করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

নিম্নোদ্ধৃত সন্দর্ভ তাঁহার 'বিদ্যাসাগর'-চরিত-নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইল। সমগ্র প্রবন্ধ তাঁহার 'চারিত্রপূজা'-নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে যত টুকু সঙ্কলিত হইল ইহাতেই ছাত্রগণ তাঁহার রচনার বিশেষত্বের যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারিবে।]

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাত-প্রবণ বাঙালী হৃদয়কে যত

শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালীজন-সুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায়, তাহা নহে, তাহাতে বাঙালী-দুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচলকর্ত্তৃত্ব সর্ব্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমাশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্ত্ত-কালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃত কলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শাল্‌সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন, তাঁহার চাক্‌রি লইবার ইচ্ছা আছে কি না, অগ্রে জানা আবশ্যক। শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেই দিনই ত্রিশ ক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠী অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরদিন তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি লইয়া পুনরায় পদব্রজে যথা সময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরের উপকারকার্য্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ্‌ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ্‌ না থাকাতে তাহা সঙ্কীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে

হইলে দৃঢ় বীর্য্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্ম্ম-প্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোন ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজী গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্তু একখানা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছু মাত্র সাহায্যচেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সর্ব্বদাই শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্য্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেক স্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সঙ্কট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী-দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না, তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতারক্ষার নিয়ম লঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি, কোন এক গ্রাম্যমেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে, ঘৃণা করিয়া কেহই তাহার অন্ত্যেষ্টিসৎকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয় পরিজনের অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগালকুক্কুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়।

আমরা অতি সহজেই 'আহা উহু' এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ,—পুরুষোচিত; এইজন্য তাহা সরল এবং নির্ব্বিকার; তাহা কোথাও সূক্ষ্মতর্ক তুলিত না, নাসিকা কুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুতপদে, ঋজু রেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসঙ্কোচে আপন কার্য্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখন রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন কি, খর্ম্মাটাড়ে এক মেথরজাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটীরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্দ্ধমানবাসকালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়-নির্ব্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবন চরিতে লিখিয়াছেন—"অন্নচ্ছত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজমহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুইপলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈল বিতরণ করিত তাহারা, পাছে মুচি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় তফাৎ হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন।"

এই ঘটনাশ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে—কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটী নিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচ-জাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানব-ধর্ম্মবশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহা-দিগকে ভালমানুষ অমায়িকপ্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ কর্ত্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না।

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙালীর বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড় বড় গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহা-দুরীতে ছোটে ভাল, কিন্তু কর্ম্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদি-চ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথো-চিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত, তবে যিনি একসময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠ-

শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি অকুতোভয়ে চাক্‌রী ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবনের মধ্যপথে সচ্ছল স্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে যিনি ভূরিভূরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্ত্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়-সঙ্কল্পের ঋজুরেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায়, কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্রপরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক, শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুরসরসশাখাপল্লব-সম্পন্ন সরল মহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে—তেম্‌নি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্য্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্ব্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মেট্রপলিটান্‌-বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন—ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্ম্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের

বুদ্ধি,—এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না ; এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে, সমগ্রভাবে কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জ্জন দিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্ম্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মত কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্ম্মবুদ্ধি বাঙালীর মধ্যে বিরল !

যেমন কর্ম্মবুদ্ধি, তেমনি ধর্ম্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে, তাহার দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন—"ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।" ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের। তাহা পণ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে। কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আপন সংস্রবের সকল জিনিষকেই অলক্ষিতভাবে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলে। যাহা সরল, যাহা স্বাভাবিক, যাহা উন্মুক্ত-উদার, যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বিধাতা যাহা আলোক ও বায়ুর ন্যায় মনুষ্যসাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মানুষ আপনি তাহাকে দুর্ম্মূল্য-দুর্গম করিয়া দেয়। সেইজন্য সহজ কথা ও সরল ভাব প্রচারের জন্য লোকোত্তর মহত্ত্বের অপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার

সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্ব্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষত্ব সববদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্য্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই ;—তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না। এই দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্ম্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ব্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন। ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্ত্তমান নাই,—কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল, সবল, অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যা-সাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত দুর্গম-বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য্য-বীর্য্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমা-দের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন।

প্রাচীন মুসলমান নৃপতিগণের বাঙ্গালা-চর্চ্চা।

[প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা, ইতিহাস-সঙ্কলন ও তাহার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টায় দীনেশচন্দ্র অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠকগণের সৌভাগ্যক্রমে এই অক্লান্ত কীটদষ্টপুঁথির সংগ্রাহক নিতান্ত কবিত্ববোধশক্তি-বর্জ্জিত নহেন। সেই জন্যই তাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা কেবল প্রাচীনকবি-প্রণীত কাব্যের নীরস তালিকা ও তাহাদের সময় নিরূপণ-সম্বন্ধিনী শুষ্ক গবেষণামাত্র প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি প্রাচীন সাহিত্যে যাহা মধুর ও যাহা প্রাণস্পর্শিসৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, সুবিধা হইলেই তাহা কবিতার ভাষার ন্যায় মধুর ও কোমলসৌন্দর্য্যময় ভাষায় বঙ্গীয় পাঠককে উপহার দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাঁহার এই সৌন্দর্য্যালোচনার ফলেই সাধারণে তাঁহার নিকট হইতে 'বেহুলা' 'ফুল্লরা' প্রভৃতি গ্রন্থ পাইয়াছেন।

দীনেশচন্দ্রের বর্ত্তমানকালীন রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হয়। এই প্রভাব তাঁহার ভাষার কবিসুলভ কলানৈপুণ্যেই মাত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, বস্তুতঃ শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্রের রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের রুচির অনুবর্ত্তিতাই বেশি দেখা যায়। নিম্নোদ্ধৃত সন্দর্ভ তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। এই গ্রন্থ তাহার সাহিত্যগবেষণার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ।]

মুসলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বপর্য্যন্ত ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী ও প্রাগ জ্যোতিষপুরের পশ্চিমস্থিত বৃহৎ ভূভাগ—

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ছিল; এই পঞ্চবিভাগের সাধারণ নাম ছিল 'পঞ্চগৌড়'। এই নাম গৌড়দেশেরই প্রভাব-ব্যঞ্জক, বস্তুতঃ গৌড়-দেশ অতি প্রাচীন রাজ্য। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, কিন্তু সমধিক পরাক্রান্ত রাজা, সেক্‌সনদিগের 'বৃটওয়াল্ডার' ন্যায় গর্ব্বপূর্ণ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউন্‌সাঙ শীলাদিত্য মহারাজকে এই 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধিবিশিষ্ট দর্শন করিয়া যান। গৌড়দেশীয় রাজগণ অনেকবার এই গর্ব্বিত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কিরণ-স্থবর্ণের রাজা শশাঙ্কগুপ্ত কান্যকুব্জাধিপতি রাজ্যবর্দ্ধনকে যুদ্ধে জয় করিয়া নিহত করেন। বৌদ্ধরাজাদিগের মধ্যে গোপাল, দেবপাল ও জয়পাল সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জয় করেন। ইঁহারা এতদূর ক্ষমতাশালী ছিলেন যে, পঞ্জিকায় কলিযুগের রাজচক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের নামও উল্লিখিত দেখা যায়। বলা বাহুল্য ইঁহারাই 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধির প্রকৃত রূপে বাচ্য ছিলেন। এই গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহই বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির প্রথম কারণ। বঙ্গভাষার প্রাচীন গীতিসমূহে 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' সংজ্ঞা অনেক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু বোধ হয়, কালক্রমে কবি ও স্তুতিজীবিগণের দ্বারা এই উপাধির অর্থচ্যুতি ঘটিয়াছিল।

ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ভাষাগ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইঁহারা "সর্ব্বনেশে" উপাধি প্রদান

করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদকগণের জন্য ইঁহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এদিকে গৌড়েশ্বরগণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও 'ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়সমীর'-এর ন্যায় পদাবলী প্রতি-নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। সেখানে 'তৈলাধার পাত্র' কিংবা 'পাত্রাধার তৈল' প্রভৃতি ন্যায়ের কূট মীমাংসিত হইত; এবং নৈষধাদি কাব্যের অলঙ্কাররহস্য ও দর্শনের সূক্ষ্মগ্রন্থি মোচনের জন্য বুদ্ধিজীবিগণ সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। এই সমৃদ্ধ সভাগৃহে বঙ্গভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল? ব্রাহ্মণগণ ইহাকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কি কারণে এই ভাষার প্রতি সদয় হইয়া উঠিলেন?

আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মুসলমানগণ ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন্ না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু-প্রজামণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মস্‌জিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল; মহরম, ঈদ, সবেবরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাসনিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগের

ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাদের পরম কৌতূহল হইল।

গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্ত্তনায় হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল। গৌড়েশ্বর নসির খাঁ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তাঁহার রাজ্যকাল ৪০ বৎসর ব্যাপক ছিল। এই মহাত্মা মহাভারতের একখানি অনুবাদ সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। সেই মহাভারতখানি এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; কিন্তু পরাগল খাঁর আদেশে অনূদিত পরবর্ত্তী মহাভারতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবি বিদ্যাপতিও এই নসিরা শাহ এবং গৌড়েশ্বর 'প্রভু গয়সউদ্দিন সুলতানে'র প্রশংসা করিয়াছেন। নসির খাঁ যে প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন, বিদ্যাপতির পদে তাহার আভাস আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ গৌড়েশ্বরের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ রাজা গণেশ ছিলেন; কিন্তু ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করিবার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা মুসলমান সম্রাটগণের দৃষ্টান্তানুযায়ী। কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষরূপে মুসলমানপ্রভাব-চিহ্নিত ছিল; অমাত্যের খাঁ উপাধিতেই তাহা দৃষ্ট হয়। হুসেন শাহ কুলীন-গ্রামবাসী মালাধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ রচনায় নিযুক্ত করেন, এবং উক্ত কবি ভাগবতের দশম ও একাদশ অধ্যায় সুচারুরূপে অনুবাদ করিলে তাহাকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট্ হুসেন সাহের প্রশংসাসূচক অনেক কবিতা বাঙ্গালা

প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কাব্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হুসেন শাহের প্রধান সেনাপতি পরাগল খাঁ পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় করিতে প্রেরিত হন। ইনি চট্টগ্রামে আসিয়া মগদিগকে দমন করেন এবং নোয়াখালি জেলায় একখানি গ্রাম পত্তন করিয়া তাহাতে বসবাস করেন। এই গ্রামের নাম পরাগলপুর। পরাগলপুরে খাঁ সাহেবের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন। পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক কবি স্ত্রী-পর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটিখাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী নামক জনৈক কবি অশ্বমেধ-পর্ব্বের অনুবাদ সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকে ছুটিখাঁর প্রতাপ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ।
পর্ব্বতে গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥"

এই সকল অনুবাদপুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজকার্য্যাবসানে মুসলমান সম্রাটগণ পাত্র-মিত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কবি আলওয়াল আরাকান-রাজ্যের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের আদেশে তাঁহার বিখ্যাত পদ্মাবতী কাব্যের অনুবাদ রচনা করেন। মাগন ঠাকুর নাম দেখিয়া জাতি ভুল করিবার আশঙ্কা আছে, সুতরাং বলা উচিত, মাগন ঠাকুর মুসলমান ছিলেন। সোলেমান নামক অপর জনৈক মুসলমান বড়লোকের আদেশে একখানি পার্শী গল্পপুস্তকের

বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন; দৌলত কাজি নামক অপর একজন কবি পূর্ব্বোক্তভাবের আশ্রয় লাভ করিয়া 'লোর চন্দ্রাণি' নামক কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং মুসলমান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্যই রাজদ্বারে দীনা হীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহ্বান পড়িয়াছিল। গৌড়েশ্বরগণ যে ভাষাকে উৎসাহ প্রদান করিলেন, হিন্দুরাজগণ তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সম্রাটগণের দৃষ্টান্ত পল্লীর জমিদারগণ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালাভাষা এই ভাবে হিন্দুরাজ-সভায় প্রতিপত্তি লাভ করিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ অনন্যগতি হইয়া ইহার পরি-চর্য্যায় লাগিয়া গেলেন।
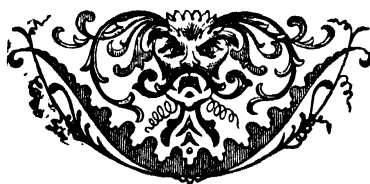
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

পৃথিবীর বয়স।

[দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সরস ও কৌতুকময় ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিবার চেষ্টায় রামেন্দ্রসুন্দরের মত সাফল্যলাভ আর কেহ করেন নাই। তাঁহার 'প্রকৃতি' ও 'জিজ্ঞাসা' বাঙ্গালাসাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন। প্রথম গ্রন্থে কয়েকটী অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং দ্বিতীয় গ্রন্থে কয়েকটী গভীর-তত্ত্বালোচনা-সম্বলিত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই দুইখানা গ্রন্থ ও 'বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের' উন্নতি কল্পে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য বাঙ্গালা-সাহিত্য চিরদিন তাঁহার নিকট অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ থাকিবে। তাঁহার ভাষা অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের ভাষার গঠনে গঠিত হইলেও তাহাতে তাঁহার প্রচুর মৌলিকতা আছে। নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধ তাঁহার 'প্রকৃতি' হইতে সংগৃহীত হইল।]

জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া মোটের উপর আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেন না জননী ভূমিষ্ঠ (?) হইবার সময় তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যে কাহারও উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল না, সেই জন্য জন্মকাল-নির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠীর একান্ত অভাব। তথাপি যে জন্মকাল-নির্দ্ধারণ একেবারে অ-সম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া আপন অক্ষমতাপ্রদর্শনে বড়ই লজ্জাবোধ হয়। পক্ক কেশের প্রাচুর্য্য ও লোল চর্ম্মের পরিমাণের সহিত ভগ্নাবশিষ্ট দন্তের সংখ্যা মিলাইলে অতি বড় প্রাচীনেরও বয়ঃক্রম অনেক সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। অতএব এই প্রচ-

লিত সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রাচীনা জননীর বয়স নিরূপণ করিতে গেলে নিতান্ত বাতুলতা না হইতে পারে।

তবে এরূপ প্রাজ্ঞের অস্তিত্বও বিরল নহে, যাঁহারা কর-রেখা বা ললাটরেখামাত্র দেখিয়া নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া জন্মকালের রাশিনক্ষত্রের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বোধ হয় এই পদ্ধতিরই কোনরূপ বিচারের দ্বারা এককালে স্থির হইয়া-ছিল, বসুন্ধরার বয়ঃক্রম ছয়হাজার বৎসরমাত্র। আমরা এই সকল কোষ্ঠী-উদ্ধারকের ক্ষমতার প্রশংসা করি; কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত বিচারপ্রণালীর মাহাত্ম্য আমাদের মস্তিষ্কে আসে না। সুতরাং তাঁহাদের গণনার সত্যতাবিচারে আমাদিগের অধিকারও নাই, প্রবৃত্তিও নাই।

অগত্যা প্রথমোক্ত আন্দাজনামক বিচারপ্রণালী অবলম্বনে যাহা ধার্য্য হইয়াছে, তাহারই উল্লেখে আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

দুঃখের বিষয় যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও একটা প্রকাণ্ড মতভেদ দেখা যায়। মোটের উপরে ইঁহারা দুই দলে বিভক্ত। একদল বলেন, মাতাঠাকু-রাণীর বয়সে গাছপাথর নাই; আর একদল বলেন, জননীর জন্মগ্রহণ, সে ত কালিকার কথা। প্রথম দল চর্ম্মের লোলতা ও ভগ্নদন্তের সংখ্যা দেখিয়া বিচার করেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন, এইত সে দিন জননীর জন্য সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইতে-ছিল, সূতিকাগৃহের দেওয়ালে তাহার তারিখ লেখা দেখিতে পাইতেছি।

আন্দাজ ব্যাপারকে যদি যুক্তি অভিধান দেওয়া যায়, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের প্রযুক্ত যুক্তি কতকটা এইরূপে দেখান যাইতে পারে।

ভূবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা প্রথম সম্প্রদায়ের অবলম্বন। আমাদের বর্ত্তুলাকারা জননীর দেহের অভ্যন্তরে অস্থিকঙ্কালের বিন্যাস কিরূপ আছে, তাহা ঠিক্ জানি না ; তবে ভিতরটা বড় গরম ; এবং সময়ে সময়ে অন্তরিন্দ্রিয় চঞ্চল হইলে যেরূপ হৃৎ-স্পন্দন ও ক্রোধবহ্নির উদ্গিরণ ঘটে, তাহা হতভাগ্য পুত্রকন্যার পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

যাহা হউক উপরের চর্ম্মখানা অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়াতে অপোগণ্ডগুলি কোন রকমে কোলে পিঠে চাপিয়া দিন কাটাইতেছে।

উপরের সেই চর্ম্মখানি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত দেখা যায় ;— কতকটা পেঁয়াজের খোসার মত। কিন্তু, হায়, সেই স্তরগুলি অনুসন্ধান করিলে আমাদের কত ভাইভগিনীর অস্থিকঙ্কালের অবশেষ সেই স্তরমধ্যে প্রোথিত ও নিহিত দেখিয়া আমাদের নিজ পরিণামের জন্য দীর্ঘশ্বাস আপনা হইতে ফেলিতে হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সেই স্তরমধ্যে যাহাদের দেহাবশেষ দেখা যায়, তাহারাও এক কালে আমাদেরই মত দর্পের সহিত পা ফেলিয়া বিচরণ করিত, কিন্তু আকারপ্রকারে তাহাদের সহিত আমাদের কত প্রভেদ ! তাহারাও আমাদের মত জীব-ধর্ম্মা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কেমন জীব !

স্তরগুলি সর্ব্বত্র যথাবিন্যস্ত নহে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাঁকিয়া

জননীর পৃষ্ঠদেশের ভীষণ বন্ধুরতা সম্পাদন করিয়াছে; কিন্তু তথাপি মোটের উপর স্তরগুলির বিন্যাসে একটা ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল পুরাতন জীবের অবশেষ স্তরে স্তরে নিহিত দেখি, তাহাদেরও আকারে প্রকারে গঠনে একটা কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিক বিকাশ বা উন্নতি বা অভিব্যক্তির নিদর্শন দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই যে অদ্যাপি অসংখ্য স্রোতস্বতী জলধারা ধীরভাবে ও অলক্ষিতভাবে অথচ অবিরামে পাহাড়পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া গুঁড়িয়া ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা অপনয়নের চেষ্টায় আছে ও সাগরগর্ভে প্রাচীন স্তরাবলীর উপরে আরও একটা স্তর গড়িয়া তুলিতেছে। অদ্যাপি পুরাতনী সুরধুনীর সহস্রধারা "গতপ্রাণী মৃতকায়া" সহস্রজীবের কাকশৃগালপরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত করিয়া ভবিষ্যতের ভূতত্ত্ববিদের নিমিত্ত সেই স্তরমধ্যে সমাহিত করিয়া রাখিতেছে।

অদ্য বঙ্গদেশে গঙ্গামুখে বা মিশরদেশে নীলমুখে যে ব্যাপার ঘটিতেছে, কত কোটি বৎসর ধরিয়া কত নদনদী ভূপৃষ্ঠের সেই বন্ধুরতাপনোদন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। অদ্যাপি যে প্রণালীতে অলক্ষিত ভাবে এই স্তরবিন্যাস ব্যাপার চলিয়াছে, অতি প্রাচীন কালেও যে সেই প্রণালীক্রমেই অলক্ষিতভাবে স্তরবিন্যাস ব্যাপার ঘটিত, তাহাতে সংশয় করিবার সম্যক্ কারণ দেখা যায় না। সেই প্রণালীক্রমেই স্তরের উপরে স্তর জমিয়া প্রায় লক্ষফুট স্থূল আবরণখানি ধরণীর পৃষ্ঠোপরি জমিয়া গিয়াছে। গঙ্গা, নীল, মিসিসিপি প্রভৃতি বড় বড় স্রোতস্বতী বৎসরে কত মাটি বহিয়া থাকে, মোটামুটি নির্দ্ধারণ করিয়া

পৃথিবীর এই ত্বগাবরণ কতকালে নির্ম্মিত হইয়াছে, কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

একটা উদাহরণ দিতে পারি। উদাহরণটি মৃত আচার্য্য হক্সলির নিকট গৃহীত। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক যুগ ছিল, যখন বড় বড় ভূখণ্ড মহাবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। ভূপৃষ্ঠের উপরে সেই আরণ্য উদ্ভিদের অবশেষ জমিয়া গিয়া একটা বিস্তীর্ণ আস্তরণস্বরূপ হইত। কালক্রমে ভূগর্ভের সঙ্কোচনে সেই ভূখণ্ড বসিয়া গিয়া সমুদ্রগর্ভে পরিণত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য নদনদী মৃত্তিকা আনিয়া সেই উদ্ভিজ্জ আস্তরণের উপরে বিন্যাস করিত। এইরূপে সমুদ্রগর্ভের পূরণ হইলে উহা আবার স্থলে ও মহারণ্যে পরিণত হইত। আবার তাহার উপর উদ্ভিজ্জ আস্তরণ। আবার তদুপরি মৃৎস্তর। এইরূপে কতকাল ধরিয়া উদ্ভিজ্জ স্তরের উপর মৃণ্ময় স্তর, তদুপরি আবার উদ্ভিজ্জ স্তর, জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীর ত্বক্ নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমরা সেই ত্বকের আবরণ স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া পাথরকয়লা তুলিয়া স্বকার্য্য সাধন করি। ত্রিশ চল্লিশ হাত স্থূল এক একটা পাথরকয়লার স্তর দেখা যায়, এবং স্থানে স্থানে এই রূপ দুইশত আড়াইশত স্তর উপর্য্যুপরি থাকে থাকে সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মনে কর পঞ্চাশ পুরুষ উদ্ভিদের দেহাবশেষ জমিয়া পাথরকয়লার একফুট স্তর জন্মে; মনে কর এক এক পুরুষ উদ্ভিদের জীবনকাল গড়ে দশ বৎসর। তাহা হইলে একফুট স্তর জমিতে পাঁচশ বৎসর লাগিবে। পঞ্চাশ ফুট স্থূল স্তরের আড়াইশটা উপর্য্যুপরি

বিন্যস্ত হইতে ষাটিলাখ বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হইবে।

মনে রাখিও পাথরকয়লার স্তরোৎপত্তির কাল পৃথিবীর বয়সের এক সামান্য ভগ্নাংশমাত্র। বুঝিয়া দেখ পৃথিবীর বয়স কত!

ভূতত্ত্ববিদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা কালের আদি কল্পনা করিতে পারি না। অনাদি কালের নিকট কোটি কোটি বৎসর নিমেষের মত। তাই ভূতত্ত্ববিৎ নিঃসঙ্কোচে পৃথিবীর পঞ্জরস্থ এক একটা স্তরনির্ম্মাণে দশবিশকোটি বৎসরের ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না।

ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রায় একই পথে চলেন। জীববিদ্যা বলেন, মানুষের নিকট জ্ঞাতি মর্কট। মর্কট রূপান্তরিত হইয়া মানুষে পরিণত হইয়াছে। অন্ততঃ মানুষের উৎপত্তির অন্য কোন বিচারসঙ্গত বিধি কাহারও মাথায় আসে নাই। কিন্তু মনুষ্য যে কত সহস্র বৎসর মনুষ্যাকারে ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান, তাহার নির্ণয় দুরূহ। অন্ততঃ গত লক্ষবৎসরের মধ্যে মনুষ্যশরীরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মর্কটদেহের মনুষ্যত্বে পরিণতিতে যে কত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার অতি সামান্য জীবাণু হইতে মর্কটমহাশয়ের অভিব্যক্তিব্যাপারে যে কত কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে!

অতএব নিঃসংশয়ে সাব্যস্ত হইল, যে বিগত কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ভূপঞ্জরে স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপার আজিকার মতই

ধীরভাবে চলিতেছে ; এবং বিগত কোটি কোটি বৎসরমধ্যে অঙ্গহীন অচেতন জীবাণু হইতে অভিব্যক্তির ধারাক্রমে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে! অর্থাৎ কিনা, প্রাচীনা বসুন্ধরার বয়সের কূলকিনারা নাই।

ভূতত্ত্ববিৎ ও জীবতত্ত্ববিৎ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এমন সময়ে জগদ্বিখ্যাত সার উইলিয়ম টমসন (লর্ড কেলবিন) একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে,—সে বড় বেশী দিনের কথা নয়,—পৃথিবীর অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তখন বসুন্ধরার জন্য সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল মাত্র। জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা সেই সূতিকাগৃহের প্রাচীরে নির্ম্মাণের তারিখ অঙ্কিত দেখিতেছে। আজ যে ভাবে নদনদী স্তরনির্ম্মাণ করিতেছে, তখনও যে সেই ভাবে স্তরনির্ম্মাণ করিত, তাহা বলা অনুচিত। তখন যে পৃথিবী জীবাধিবাসের উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সন্দেহের কারণ প্রধানতঃ তিনটি।

প্রথম,—সম্প্রতি পৃথিবী একদিনে এক পাক আবর্ত্তিত হয়। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব মুখে ঘুরিতেছে ; আর চন্দ্র পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সমুদ্রের জলরাশিকে আপনার দিকে টানিয়া রাখিয়াছে। তাই পৃথিবীর আবর্ত্তনে বাধা পড়িতেছে। এই জলরাশির বিপরীতক্রমে বিরুদ্ধমুখে পৃথিবীকে ঘুরিতে হইতেছে। যেন একখানি চাকা বেগে ঘুরিতেছে ; আর তাহার পরিধিতে একখণ্ড কাঠ সংলগ্ন থাকিয়া সেই আবর্ত্তনে

ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এই ব্যাঘাতের ফলে আবর্ত্তনের বেগ ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। গত দুই হাজার বৎসরেই আবর্ত্তনের বেগ একটু কমিয়া গিয়াছে, একপাক আবর্ত্তনের কাল একটু বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অহোরাত্রের পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য এই কারণে বহুদিন হইতে পৃথিবীর আবর্ত্তনের বেগ মন্দীভূত হইতেছে। সহস্রকোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর বেগ বর্ত্তমান বেগের দ্বিগুণ ছিল, গণনায় কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। আজ কাল যে ঘণ্টার চব্বিশ ঘণ্টায় অহোরাত্র হয়, তখন সেই ঘণ্টার বার ঘণ্টায় অহোরাত্র হইত। সুতরাং তখন পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল, তাহার সহিত আজিকার অবস্থার কোন তুলনা হইতে পারে না; ভূতত্ত্ববিদেরা যে এক নিঃশ্বাসে লক্ষকোটি বৎসরের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, জ্যোতির্ব্বিদ্যার হিসাবে তাহার কোন মূল্য নাই। একালের স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপার দেখিয়া সে কালের স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপারের সহিত তাহার কোন তুলনা আনিতে পারা যায় না।

দ্বিতীয়,—সূর্য্য পৃথিবীকে সম্প্রতি যে পরিমাণে তাপ দিতেছে, তাহার মোটামুটি পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এই তাপের কিয়দংশমাত্র লইয়া নদনদীর সৃষ্টি ও গতি ও জীবের উৎপত্তি ও লীলাখেলা চলিতেছে। সূর্য্য কিছু চিরকাল ধরিয়া এই পরিমাণে তাপ দিয়া আসিতেছে না। বোধ হয় পাঁচশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য একবারেই তাপ দিত না। তখন সূর্য্যের তাপবিকিরণশক্তি ছিল না। সুতরাং তখন

পৃথিবীতে মেঘবৃষ্টিও ছিল না, নদনদীও ছিল না; জীবের অস্তিত্বের কথাই নাই।

তৃতীয়,—পৃথিবী একটা তপ্ত পিণ্ডমাত্র। কেবল উহার উপরের চামড়াটা অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে মাত্র। বৎসর বৎসর প্রচুর পরিমাণে তাপ পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া দিগন্তে বিকীর্ণ হইতেছে। অর্থাৎ কি না, পৃথিবী ক্রমেই শীতল হইতেছে। আজ পৃথিবীর অবস্থা কেমন, ও বৎসর বৎসর কত তাপ খরচ হইয়া যাইতেছে, জানিলে ভবিষ্যতে কোন্ দিন পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হইবে, গণিয়া বলা যাইতে পারে। সেইরূপ অতীত কালে, অন্ততঃ কয়েক কোটি বৎসর পূর্ব্বে, পৃথিবীর কখন্ কি অবস্থা ছিল, তাহাও গণিয়া বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে পৃথিবী আরও গরম ছিল, সন্দেহ নাই। লর্ড কেলবিনের গণনার দশকোটি কি জোর বিশকোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এত গরম ছিল, যে তখন ভূপৃষ্ঠে শীতল কঠিন চর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। তখন ভূপৃষ্ঠ উষ্ণ ও তরল ছিল। সুতরাং তখন পৃথিবীতে জীবের উদ্ভব হয় নাই। টেট্ সাহেবের গণনায় এই কাল দশ বিশ কোটি বৎসর পর্য্যন্তও উঠে না। তিনি দুই এক কোটি বৎসরের ঊর্দ্ধে উঠিতে চাহেন না।

দাঁড়ায় এই। পৃথিবীর বয়ঃক্রম বড় বেশি নহে। ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা বয়সের ইয়ত্তা করিতে চাহেন না, সেটা বিষম ভুল। কয়েক কোটি বৎসর মাত্র, হয়ত এক কোটি বৎসরও নহে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ শীতল ও কঠিন হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে

স্তরবিন্যাস, জীবের উদ্ভব, জীবপর্য্যায়ে উন্নতি, এই সমুদয় ব্যাপার হয়ত কয়েক লক্ষ বৎসরমাত্রেই ঘটিয়াছে।

উভয় পক্ষের বিবাদের ফল এইরূপ দাঁড়াইল। ভূপৃষ্ঠের কাঠিন্য প্রাপ্তির পর হইতে যদি পৃথিবীর বয়ঃক্রম হিসাব করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি অথবা কয়েক লক্ষ বৎসরমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। তৎপূর্ব্বে পৃথিবী এত গরম ছিল, যে তখন জীবনিবাস সম্ভবপর হয় নাই। হয়ত সূর্য্য হইতে সম্যক্‌পরিমাণ তাপও তখন আসিত না। হয়ত পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ তখন এত প্রবল ছিল, যে এ কালের দিবারাত্রি ঋতুপরিবর্ত্তনাদির সহিত সে কালের তত্তৎ ঘটনার কিছুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। ভূবিদ্যা যে অম্লানভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠের একখানি সূক্ষ্ম পরদা গাঁথিতে দশবিশকোটি বৎসর চাহিয়া বসেন, এবং জীববিদ্যা যে কেবল মর্কটকে মানুষ বানাইতে বহু লক্ষ বৎসর চাহেন, তাঁহাদের সেরূপ দাবি অগ্রাহ্য।

আচার্য্য হক্সলি ভূবিদ্যাবিদের ও জীববিদ্যাবিদের তরফ হইতে জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লর্ড কেলবিন ভূবিদ্যাকে কোটি দশেক বৎসর মঞ্জুর করিতে প্রথমে রাজি ছিলেন। ভূপৃষ্ঠে প্রায় লক্ষ ফুট স্থূল স্তরের পরদা জমিয়াছে। তাহা হইলে গড়ে হাজার বৎসরে এক ফুট করিয়া স্তর জমিয়াছে স্বীকার করিতে হয়। ইহা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে; এবং হক্সলির মতে ভূবিদ্যার পক্ষেও এই পরিমিত কালের অধিক দাবি করিবার বিশেষ

প্রয়োজন নাই। এই দশ কোটি বৎসর মধ্যেই লক্ষ ফুট স্তর জমিয়াছে ও এই বিচিত্র জীবজগতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা বিবিধ প্রাণী ও বিবিধ উদ্ভিদের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, ইহা কোনক্রমেই অসম্ভব নহে।

আর একটা কথা; কেলবিনের বিচারপ্রণালীতে কোন ভুলের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যে সকল সংখ্যা লইয়া তিনি হিসাবে বসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের কবুল মতেই আন্দাজি। ভূপৃষ্ঠে জলস্থলের সমাবেশের একটু ব্যবস্থাভেদ ঘটিলেই, সমুদ্রের জল খানিকটা জমাট বাঁধিয়া বরফস্তূপের আকারে মেরুপ্রদেশ দিয়া সরিয়া গেলেই, পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগে এক আধটু ব্যতিক্রম হইয়া যাইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন্ সময়ে জলস্থলের বা জলবরফের সমাবেশ কিরূপ ছিল, না জানিলে আবর্ত্তনের বেগসম্বন্ধে কোন একটা সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা কঠিন। লর্ড কেলবিন এই সকল কথা স্বয়ংই তুলিয়াছিলেন। তার পর সূর্য্যের অবস্থা-সম্বন্ধে এবং সূর্য্যকর্তৃক বিকীর্ণ তাপের পরিমাণসম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বড়ই কম; কেলবিন স্বয়ংই এই বিষয়ে স্বকীয় সিদ্ধান্ত কয়েকবার পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং ঠিক্ এত বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য তাপ বিকিরণ করিত না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা দুঃসাহসিক ব্যাপার। তার পর পৃথিবীর নিজের তাপের কথা। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশটা আমাদের পরিচিত; কিন্তু উহার আভ্যন্তরিক অবস্থাবিষয়ে আমরা এক্ষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভূগর্ভে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদের তাপপরিচালন-ক্ষমতা

কিরূপ, এবং উষ্ণতাসহকারে তাহাদের তাপপরিচালন-ক্ষমতা বাড়ে কি কমে, এই সকল গণনায় না ধরিলে তাহার উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করিতে গেলে প্রচুর ভ্রান্তিরই সম্ভাবনা। সম্প্রতি লর্ড কেলবিনের জনৈক শিষ্যই গুরুপ্রদত্ত গণনার বিশুদ্ধিপক্ষে সন্দিহান হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই সকল বিষয়ে আমাদের আরও ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। আজ কেলবিন যেখানে দশকোটি বৎসর মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত আছেন, আর একটু অভিজ্ঞতা বাড়িলেই হয়ত সে স্থলে পঞ্চাশকোটি দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে ভূবিদ্যাবিদের ও প্রাণিতত্ত্ববিদের পরাজয় স্বীকার করিয়া হাল ছাড়িয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আশা করা যায়, অচিরকালে ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া মিটমাট করিযা ফেলিবেন। আমরাও তখন জননী বসুন্ধরার বয়সের তথ্য কতকটা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইব।

শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত।

ইস্‌লাম-প্রতিষ্ঠার কারণ।

[মাসিকপত্রাদিতে নানা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত আধুনিক বাঙ্গালাসাহিত্য-পাঠকের নিকট সুপরিচিত হইয়াছেন। মুসলমান ও প্রাচীন আরব্য জাতির ইতিবৃত্ত এ পর্য্যন্ত যে কয়খানা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলি-ই ইংরেজি ভাষায় লিখিত। এমন কি মহম্মদেরও একখানা সুন্দর ও বিস্তৃত জীবন-চরিত বাঙ্গালা ভাষায় নাই। মুসলমানদের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপ উদাসীনতা বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের কলঙ্কের কথা। ধর্ম্মাচার্য্য গিরিশচন্দ্র সেন কোরাণের বঙ্গানুবাদ করিয়া আরবী ও ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের উপকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করিয়াছেন। মুসলমানগণের মধ্যে বিষাদসিন্ধু-প্রণেতা মীর মশারফ হোসেন ইস্‌লাম ইতিহাসের এক অশ্রু-কলঙ্কিত অধ্যায় হৃদয়স্পর্শিনী ভাষায় বিবৃত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টির সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপ আর দুই একজন মাত্র লেখকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে যাঁহারা বাঙ্গালায় ইস্‌লাম ইতিহাসের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন বা তাহার সাহায্য করিতেছেন। যে পর্য্যন্ত আরও অধিক সংখ্যক সাহিত্যানুরাগী মুসলমান এই কার্য্যে অগ্রসর না হইতেছেন, সে পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না।

অনেকের বিশ্বাস আছে, এবং অনেক বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাসেও লিখিত আছে, মুসলমানগণ এক হস্তে তরবারি ও এক হস্তে কোরাণ লইয়া ইস্‌লাম প্রচার করিয়াছিলেন। আধুনিক গবেষণায় এই মত একরূপ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই প্রবন্ধে মহম্মদের

জীবিতকালে ইস্লাম-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে ইস্লাম-প্রতিষ্ঠাতার শেষ উপদেশ ও চরিত্রসমালোচনাও সন্নিবেশিত হইয়াছে।]

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পীড়াক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। একাদশ হিজরীর রবিঅল্-আউয়ল মাসের ৯ই তারিখ শুক্রবার আগত হইল। মোহাম্মদ চিরাগত প্রথামত মস্জিদে উপাসনার জন্য গমন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু দৌর্ব্বল্যবশতঃ দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে আবুবকর মসজিদে গমন করিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সমবেত উপাসকগণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, অনেকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। মোহাম্মদ এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া আলী ও আব্বাসের স্কন্ধে ভর করিয়া মস্জিদে গমন করিলেন। আবুবকরের উপাসনা শেষ হইলে তিনি সমবেত মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার মৃত্যুর জনরব শুনিয়া ভীত হইয়াছ। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কি কোন পয়গম্বর চিরজীবী হইয়াছেন যে, আমিও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তোমাদের সঙ্গে চিরকাল বাস করিব? সকলি ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পন্ন হয়; সকলেরি নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, তাহার অগ্র পশ্চাৎ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতেছি। তোমরা ঐক্যসূত্রে বদ্ধ থাকিও,

পরস্পরকে প্রেম ও সম্মান করিও, বিপদের সময় একে অন্যের সাহায্য করিও, একে অন্যকে ধর্ম্মবিশ্বাসে অটল থাকিতে ও সৎকার্য্য সাধন করিতে উৎসাহিত করিও। ধর্ম্মবিশ্বাস এবং সৎকার্য্যই মানুষের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। অন্য সকল কার্য্যই তাহাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়।”

মোহাম্মদ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার তিনদিন পর তিনি “প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক” বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিল। মহাপুরুষ আরব জাতির উদ্দাম স্বভাব সংযত এবং একেশ্বরবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন জীবনব্রত সাধনপূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

আরবজাতির উদ্দাম স্বভাব সংযত করিবার কিরূপ অসাধারণ ক্ষমতা মোহাম্মদের ছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। তৎকালের আরবসমাজে সুরার অতিশয় প্রচলন ছিল। অতি মৃদু প্রকৃতির লোকও সহসা সুরাপান পরিত্যাগ করিতে পারে না। উগ্র প্রকৃতির আরবীয়দের পক্ষে পান-দোষ পরিত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব ছিল। চতুর্থ হিজরীতে মোহাম্মদ সুরাপানের অবৈধতা বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এই প্রত্যাদেশের বিষয় ঘোষণা দ্বারা প্রচার করা হইয়াছিল। এই ঘোষণাপ্রচার-কালে যাহারা মদ্যপান করিতেছিল, তাহারা পানপাত্র দূরে ফেলিয়া দিল আর সুরা স্পর্শ করিল না।

সুরাপায়ীরা সমস্ত ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পথে পথে সুরাস্রোত বহিল। এ ঘটনায় কেবল যে মুসলমানের উপর মোহাম্মদের প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহা নহে, ইহাতে তাহাদের সুগভীর সরল বিশ্বাসেরও প্রমাণ রহিয়াছে।

মোহাম্মদ প্রথমতঃ ত্রয়োদশ বৎসর মক্কায় বাস করিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় পাবকশিখাসদৃশ উপদেশে কঠিনহৃদয় আরবদিগকে বিগলিত করিতে যত্ন করেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের ফলে মক্কায় অনেকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং মক্কার বহির্ভাগেও কোন কোন স্থানে (মক্কার বহির্ভাগের স্থানসমূহের মধ্যে মদিনার নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য) ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু সমগ্র আরবের লোকসংখ্যার তুলনায় ইস্‌লামধর্ম্ম-বিশ্বাসীর সংখ্যা নগণ্য ছিল। মোহাম্মদ ত্রয়োদশ বৎসরের সাধনায়ও সাফল্যলাভ করিতে অসমর্থ হইয়া এবং বিরুদ্ধবাদী কোরেশদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া সশিষ্যে মদিনায় আশ্রয়গ্রহণ করেন। মদিনার অনুরক্ত শিষ্যগণের সাহায্যে মোহাম্মদ ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে রাজশক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলেন। এই ধর্ম্মমণ্ডলীর সহায়তায় তিনি ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্মোৎসাহ, সর্ব্বগ্রাহী সাম্যবাদ, উদ্দীপনা-পূর্ণ বাগ্মিতা, নির্ম্মল চরিত্র, বিপুল সাহস এবং সুদৃঢ় সহনশীলতার কথা ক্রমশঃ আরবদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এবং তজ্জন্য আরবদেশের নানা স্থান হইতে বহু লোক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এই ভাবে আরবদেশের সর্ব্বত্র দ্রুতগতিতে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। কিন্তু মোহাম্মদের

জন্মভূমি মক্কার অধিবাসী কোরেশদের চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর বিদ্বেষ-বিষে পূর্ণ হইয়া উঠে। মোহাম্মদ পঞ্চ বৎসর মদিনায় অতিবাহিত করিয়া সশিষ্যে মক্কা-দর্শন জন্য গমন করেন। এই সময়ে তিনি কোরেশদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করেন। এই সন্ধি ইতিহাসে হোদয়বিয়ার সন্ধি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। মোহাম্মদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচার-বন্ধু আবুবকর বলিয়াছেন,—"হোদয়বিয়ার সন্ধি স্থাপন জন্য ইস্‌লামধর্ম্মের যেরূপ প্রচার হয়, আর কিছুতে সেরূপ হয় নাই।" যে সকল ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-বিশ্বাসী কোরেশদের হস্তে লাঞ্ছনার আশঙ্কায় আপনাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস গোপন রাখিত, তাহারা হোদয়বিয়ার সন্ধিতে স্বাধীন ও প্রমুক্ত হইয়া প্রকাশ্যে ইস্‌লামধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করে। ইহাতে অসংখ্য নরনারীর কুসংস্কার দূর হয়; এবং তাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে। হোদয়বিয়ার সন্ধি স্থাপনের পর মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য পারস্যরাজ, রোমক সম্রাট, মিশরের শাসনকর্ত্তা ও আবিসিনিয়ার অধিপতির নিকট দূত প্রেরণ করেন। ইহার ফলে এই সব দেশে ইসলাম ধর্ম্মের পক্ষপাতী কতিপয় ব্যক্তির উদ্ভব হয়; এবং পারস্যরাজ্যের উপবিভাগ এয়মানবের শাসনকর্ত্তা প্রজামণ্ডলীসহ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। হোদয়-বিয়ার সন্ধি স্থাপনের এক বৎসর পর মোহাম্মদ পুনর্ব্বার মক্কা দর্শন জন্য গমন করেন। এই সময়ে বহু লোক ইস্‌লামধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করে। ইহার পর বৎসর মোহাম্মদ মক্কার সমস্ত নরনারীকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মক্কায় একে-

শ্বরবাদ পরিগৃহীত হইবার পর অচিরে সমগ্র আরবদেশে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মোহাম্মদ মক্কায় শান্তস্বভাব ছিলেন; বাক্যবলই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। কিন্তু তিনি মদিনায় তেজস্বিতা প্রকাশ করেন, বাহুবল তাঁহার সহায় হইয়াছিল। মক্কায় বাসকালে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা মন্দগতিতে হইয়াছিল, মদিনা গমনের পর হইতেই দ্রুতগতিতে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়।

মোহাম্মদের আদেশে মুসলমান সৈন্য তেত্রিশবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। তন্মধ্যে তেরবার কোরেশদিগের বিরুদ্ধে, ছয়বার ইহুদিদের বিরুদ্ধে, দুইবার খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এবং বার বার বারটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা হইয়াছিল। ইস্‌লাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কোরেশদের শত্রুতাচরণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। কোরেশদের নিম্নেই ইহুদিদের বিদ্বেষভাব প্রবল ছিল। কোরেশ ও ইহুদি ধরাপৃষ্ঠ হইতে ইস্‌লাম ও মুসলমানের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। মোহাম্মদ ত্রয়োদশ বৎসর বাক্যবলে শত্রুতাচরণ নিবৃত্ত করিতে যত্ন করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া বাহুবলের প্রয়োগ করেন। মোহাম্মদ আত্মরক্ষা বা শত্রুনাশ করিবার উদ্দেশ্যেই অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, যাহার বিদ্বেষভাব যত প্রবল ছিল, তাহার বিরুদ্ধে তত অধিকবার যুদ্ধযাত্রা করা হইয়াছিল। কিন্তু পনরবারের অধিক যুদ্ধ করিতে হয় নাই। মুসলমানগণ তেত্রিশবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল, তন্মধ্যে মোহাম্মদ

পনরবার তাহাদের সহগামী ছিলেন। বস্তুতঃ, মোহাম্মদ বাহুবলের সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই। তাঁহার অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ফলে কদাচিৎ কেহ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, শত্রুকুল যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় নিবন্ধন দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে গৌণভাবে তরবারি ইস্‌লামধর্ম্মের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিল। একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠতা এবং মোহাম্মদের গুণগ্রামই মুখ্যভাবে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার হেতু ছিল। আমরা একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। মোহাম্মদ শেষবার দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁহার বিপুল বাহিনীর নিকট কোরেশেরা মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়, এবং শত্রুতাচরণ পরিত্যাগ করে। তিনি তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রেম ও করুণা বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ বিজয়ী বীরের ন্যায় মক্কায় প্রবেশ করিলে অধিনেতৃবৃন্দ দণ্ডভয়ে ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কি ভাবিতেছ?" তাহারা উত্তর করে, "ক্ষমাশীল পিতার পুত্র, আপনি আমাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।" মোহাম্মদ প্রত্যুত্তরে বলেন, "তোমাদিগকে তিরস্কার করিব না, ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি তোমাদের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তোমরা স্বাধীন, ইচ্ছা করিলে চলিয়া যাইতে পার।" মোহাম্মদের সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত মক্কাবাসী ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে।

∴ মোহাম্মদের জীবন পরমেশ্বরের সেবা ও মানবজাতির কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এ জীবনের আদ্যন্ত মধুময়। মোহাম্মদ আত্মীয়-স্বজনে স্নেহশীল ও বন্ধুবান্ধবে প্রীতিমান্ ছিলেন, তিনি দাস-দাসীর সঙ্গে সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার তিরোভাবের পর আনস নামক একজন ভৃত্য বলিয়াছিল, আমি ১০ বৎসর কাল মহাপুরুষের অধীনে কাজ করিয়াছি; তিনি একদিনের জন্যও আমাকে কটু কথা বলেন নাই। বালক-বালিকা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, অনেক সময় তাঁহাকে পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া বালক-বালিকাদিগকে আদর করিতে দেখা যাইত। তিনি জীবনে কাহাকেও কখন প্রহার করেন নাই। অভিসম্পাত বা কটুবাক্য একদিনের জন্যও তাঁহার রসনা কলুষিত করে নাই।

মোহাম্মদ পীড়িতের সেবা করিতেন, শবাধার দেখিলেই বহন করিয়া সমাধি-স্থানে লইয়া যাইতেন। ক্রীতদাসের গৃহে সানন্দে ভোজন করিতেন, স্বহস্তে জীর্ণ বস্ত্র সংস্কার করিয়া পরিধান করিতেন, অনেক সময় স্বয়ং গাভী দোহন করিতেন। তিনি সৌজন্যের আধার ছিলেন। কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎকালে হস্ত মর্দ্দন করিবার সময় তিনি কখন প্রথমে হস্ত পরিত্যাগ করিতেন না। কেহই তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত, বীরহৃদয় ও সত্যনিষ্ঠ ছিল না। তিনি আশ্রিতকে আশ্রয় দান করিতে সাতিশয় তৎপর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্ট-ভাষী ও প্রিয়বাদী ছিলেন। "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, নব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এই নীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতি-

পালন করিতেন। তিনি শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা ও দরিদ্রকে উৎসাহ প্রদান জন্য অতি দীন-হীন ব্যক্তির গৃহেও অকুণ্ঠিত চিত্তে গমন করিতেন। তাহাদের অনেকে তাঁহাকে পথিমধ্যে ধরিয়া আপনাদের দুঃখকাহিনী নিবেদন করিত। একবার তিনি অনবসরবশতঃ একজন ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু অন্ধকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এ কারণ তিনি আমরণ অনুশোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, আমি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু অন্ধকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছি। গরিব-দুঃখীর জন্য তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। অনেক গৃহহীন নিরাশ্রয় ব্যক্তি তাঁহার গৃহে রাত্রিযাপন করিত। তিনি আহারে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ও আহারান্তে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহার জীবনে একদিনের জন্যও এ নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি প্রবল শত্রুকেও অকুণ্ঠিত চিত্তে ক্ষমা করিতেন।

মোহাম্মদ কোন প্রকার বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার ভোজ্য ও পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল। এক এক দিন তাঁহাকে অন্নাভাবে অনাহারে থাকিতে হইত। অনেক সময় কেবল মাত্র খর্জ্জুর ও জল তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। কোন কোন রাত্রিতে তৈলাভাবে তাঁহার গৃহে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিত না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন, পরমেশ্বর তাঁহার নিকট পৃথিবীর ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

ফলতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা আত্মসুখ মোহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনার প্রতিষ্ঠা, পাপে আকণ্ঠনিমজ্জিত আরব-সমাজের উদ্ধার এবং বহুধা বিভক্ত আরবজাতির ঐক্যবন্ধন মোহাম্মদের প্রতিকার্য্যের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার সফল জীবন; তিনি স্বীয় মূলমন্ত্রে সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক সাধনায় মূর্খতা ও কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন আরব দেশে সত্য ধর্ম্মের রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, সে রশ্মি-সম্পাতে আরব দেশের অন্ধকার দূরীভূত হয়; এবং তদ্দেশবাসিগণ ধর্ম্মে ও চরিত্রে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বিবৃতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

জন্ম—১২২৭ সালে (১৮২০ খৃষ্টাব্দ); মৃত্যু—১২৯৮ সাল (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে); জন্মস্থান—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রাম। ঈশ্বরচন্দ্র ৯ বৎসর বয়সে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃতকলেজে প্রবেশ করেন ও ১২½ বৎসর কাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া গৌরবসূচক 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। কলেজ ত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন, পরে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে কিছুদিন অধিষ্ঠিত থাকিয়া সম্পাদকের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় পদত্যাগ করেন। অতঃপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান কেরাণীর পদ লাভ করিয়া বিদ্যাসাগর ক্রমে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক, সম্পাদক, ও পরিশেষে অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত হন, এই শেষোক্ত পদে থাকা কালে তিনি কিছুদিনের জন্য মফস্বলের বিদ্যালয় সমূহের সহকারী ইনস্পেক্টারের পদেও নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি ১২৬৫ সালে পদত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহার চরিত্র অতিশয় উদার ছিল। তাহার প্রধান কীর্ত্তি বিধবাবিবাহ প্রচলন,

মেট্রোপলিটান্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ নামক বে-সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠা, ও নানা স্থানে বিদ্যালয়স্থাপন প্রভৃতি। তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; তন্মধ্যে 'জীবনচরিত', 'বোধোদয়', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ঋজুপাঠ', 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' ছাত্রদিগের সুপরিচিত।

ইঁহার জীবন সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য কথা শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত বিস্তৃত জীবনীতে দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা—১।

পংক্তি—২। 'প্রতীহারী' :—দ্বাররক্ষণে নিযুক্তা পরিচারিকা। প্রাচীনকালে রাজগণের অন্তঃপুরদ্বাররক্ষা-কার্য্যে স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইত। উত্তরচরিতে এই স্থলে কঞ্চুকীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 'কঞ্চুকী' অন্তঃপুরচর বৃদ্ধ কর্ম্মচারিবিশেষ। 'প্রতীহারী' 'প্রতিহারী' উভয়বিধ বর্ণবিন্যাসই শুদ্ধ।

পংক্তি—৩; 'ঋষ্যশৃঙ্গ' :—ইঁহার পিতার নাম বিভাণ্ডক। অঙ্গরাজ লোমপাদ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া অযোধ্যাধিপতি দশরথের কন্যা শান্তাকে দত্তককন্যারূপে গ্রহণ করেন, পরে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। এই প্রবন্ধে বর্ণিত ঘটনার কালে ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন বলিয়া উত্তরচরিতে উল্লিখিত আছে।

পৃষ্ঠা—২।

পংক্তি—৪। 'দীর্ঘায়ুরস্তু' :—দীর্ঘায়ুঃ+অস্তু (ভবান্) অর্থাৎ আপনি দীর্ঘজীবী হউন।

পংক্তি—৬। 'জিজ্ঞাসিলেন' :—ইদানীং এইরূপ প্রয়োগ গদ্যে অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। 'জিজ্ঞাসা করিলেন' এইরূপ প্রয়োগই

অধিকতর প্রচলিত। বিদ্যাসাগর 'আমাকে' স্থানে 'আমারে' ও 'আপনাকে' স্থলে 'আপনারে'ই অধিক প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও ইদানীং প্রায় অপ্রচলিত।

'ভগবান্' ঃ—এই শব্দ সচরাচর মুনি, দেবতা প্রভৃতির নামের পূর্ব্বে সম্মান বা ভক্তি দ্যোতনার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রকৃত অর্থ 'ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিসম্পন্ন'। স্ত্রীলিঙ্গে "ভগবতী"; ১৩শ পংক্তি দেখ।

পংক্তি—৮। 'আর্য্যা' ঃ—পুংলিঙ্গে 'আর্য্য'। এই শব্দও সম্মান-দ্যোতনার্থ পূজনীয় আত্মীয় বা অপর সম্মানার্হ ব্যক্তিগণকে সম্বোধন বা তাঁহাদের উল্লেখ করিবার সময় প্রযুক্ত হয়। ইহার প্রকৃত অর্থ 'পূজ্য'। ভগবান্, আর্য্য প্রভৃতি সম্বোধন সংস্কৃত সাহিত্যেই বেশি ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় সংস্কৃতের অনুবাদ ব্যতীত অন্যত্র ইহাদের বড় প্রয়োগ নাই।

পংক্তি—১৩। 'বিশ্বম্ভরা' ঃ—পৃথিবী। কথিত আছে সীতা হল-চালনা কালে যজ্ঞবেদী হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

পংক্তি—২০। 'জামাতৃযজ্ঞে' ঃ—ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে। শান্তা দশরথের কন্যা বলিয়া দশরথের কুলগুরু বশিষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে 'জামাতা' বলিতেছেন।

পৃষ্ঠা—৩।

পংক্তি—২। 'রঘুবংশীয়দিগের' ঃ—রামচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষগণের মধ্যে রঘু অতিশয় খ্যাতিমান্ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে তদীয় বংশ রঘুবংশ আখ্যা লাভ করে। (রঘুবংশ কাব্য ২য় সর্গ ৬৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সূর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই বংশের অপর নাম 'সূর্য্যবংশ'। এই বংশের অপর এক পূর্ব্বপুরুষের নামানুসারে ইহা 'ইক্ষ্বাকুবংশ' বলিয়াও কথিত হয়। ৬ পৃষ্ঠা ১৯শ পংক্তি দেখ।

পংক্তি—৬। 'সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত' ঃ—পদ, হস্ত, জানু, বক্ষঃস্থল, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মন দ্বারা প্রণতি।

পংক্তি—১৮। 'দুর্ম্মনায়মানা' ঃ—খেদযুক্তা, দুঃখিতার ন্যায় যিনি আচরণ করিতেছেন। দুর্ম্মনাঃ+ক্যঙ্+শানচ্; স্ত্রীলিঙ্গে 'আ'-কার।

পংক্তি—২১। 'আর্য্যা জানকীর' ইত্যাদি ঃ—অপহৃতা সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে রামচন্দ্র তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ দূর করিবার জন্য তাঁহাকে অগ্নিতে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এইরূপ বৃত্তান্ত রামায়ণে উল্লিখিত আছে।

পৃষ্ঠা—৪।

পংক্তি—৩। 'পাবন' ঃ—পবিত্রতা-সম্পাদক দ্রব্য।

পংক্তি—১৫। 'সমন্ত্রক জৃম্ভক অস্ত্র' ঃ—'জৃম্ভক' কতকগুলি অস্ত্রের নাম, এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে শত্রুর চেতনানিরোধ হইয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিশ্চল হইত বলিয়া ইহার নাম 'জৃম্ভক'। এই অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহারকালে মন্ত্রপাঠ আবশ্যক হইত; এই জন্য ইহাকে 'সমন্ত্রক' বলা হইয়াছে। (এইরূপ অপর এক সমন্ত্রক অস্ত্রের কথা রঘুবংশ ৫ম সর্গ ৫৭ শ্লোকে উল্লিখিত আছে।)

পংক্তি—১৮। 'তাড়কা নিধন' ঃ—এই ঘটনা সীতাবিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। সুন্দনামক অসুরের পত্নী তাড়কা অগস্ত্য শাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঋষিদিগের যজ্ঞবিঘ্ন করিত বলিয়া, বিশ্বামিত্রের উপদেশে রাম কর্ত্তৃক নিহত হয়।

পংক্তি—২২। 'আর্য্যপুত্র' ঃ—স্বামী। এই শব্দও সংস্কৃত নাটকাদিতেই প্রযুক্ত হয়, খাঁটি বাঙ্গালায় ইহার প্রয়োগ নাই।

'হরধনু' ঃ—'হরধনুঃ' লিখিলে অধিকতর সংস্কৃতানুযায়ী হইত। বাঙ্গালায় ধনুঃ, যশঃ, মনঃ প্রভৃতি শব্দ বিসর্গহীন রূপেই সচরাচর লিখিত হয়; কিন্তু ধনুর্ব্বাণ, যশোলাভ, মনোহর প্রভৃতিতে এই

বিসর্গ সন্ধিবদ্ধ হইয়া অদ্যাপি প্রচলিত আছে। সীতার পিতা জনক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তাঁহার ইষ্টদেব মহাদেবের শরাসনে গুণ সংযোগ করিতে পারিবে তাহাকেই স্বীয় কন্যা দান করিবেন।

পৃষ্ঠা—৫।

পংক্তি—১। 'অনিমেষনয়নে' ঃ—নিমেষ-শূন্য দৃষ্টি দ্বারা। 'নিমেষ' ও 'নিমিষ' এই দুই প্রকার রূপই ব্যাকরণশুদ্ধ। নিমিষ=নি—মিষ+ক ; নিমেষ=নি—মিষ+ঘঞ্ ২২ পৃষ্ঠা, ১০ম পংক্তি দ্রষ্টব্য।

পংক্তি—৭। 'শতানন্দ' ঃ—জনকের পুরোহিত।

পংক্তি—১১। 'মাণ্ডবী' ঃ—ভরতের পত্নী, জনকের অনুজ কুশ-ধ্বজের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

শ্রুতকীর্ত্তি ঃ—শত্রুঘ্নের পত্নী ও কুশধ্বজের কনিষ্ঠা কন্যা।

পংক্তি—১২। 'ঊর্ম্মিলা ঃ—লক্ষ্মণের পত্নী ; ইনি জনকের কন্যা।

পংক্তি—১৭। 'ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী' ঃ—কথিত আছে জমদগ্নিতনয় পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী ক্ষত্রিয়হীন করেন। ইনি ভৃগুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে 'ভৃগুনন্দন' বলা হই-য়াছে। স্বীয় ইষ্টদেব মহাদেবের শরাসন একজন ক্ষত্রিয় বালক ভগ্ন করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া ইনি সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য রামের সম্মুখীন হন, কিন্তু হৃতগর্ব্ব হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা—৬।

পংক্তি—১১। 'হায়—গিয়াছে,' ঃ—এই কথাটি উত্তরচরিতে এই-রূপ আছে ;—"তে হি নো দিবসা গতাঃ"। এই সংস্কৃত বাক্যটিও অনেক সময়ে বাঙ্গালায় প্রযুক্ত হয়। ইহার অর্থ আমাদের সেই (সুখের) দিনগুলি চলিয়া গিয়াছে।

পংক্তি—১২। 'মন্থরা,' ঃ—রামের বিমাতা ও ভরতের জননী কৈকেয়ীর পরিচারিকা। কথিত আছে ইহারই পরামর্শে কৈকেয়ী দশরথের নিকট রামের বনগমন প্রার্থনা করেন।

পংক্তি—১৪। 'শৃঙ্গবের নগর' ঃ—রামের "পরম বন্ধু নিষাদ পতি" গুহকের রাজধানী। 'নিষাদ" ঃ—চণ্ডাল।

পংক্তি——২১। 'আরণ্য ব্রত'ঃ—বানপ্রস্থ ব্রত।

পংক্তি—২৩। 'চিত্রকূট' ঃ—বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কামতা পাহাড়।

া—৭।

পংক্তি—১। 'কালিন্দী-তটবর্ত্তী বটবৃক্ষ' ঃ—এই বটবৃক্ষের নাম শ্যাম। 'কালিন্দী' ঃ—যমুনা। শ্যামবট প্রয়াগ বা বর্ত্তমান এলাহাবাদে অবস্থিত ছিল।

পংক্তি—১২। বানপ্রস্থধর্ম্ম ঃ—দ্বিজাতিগণের জীবন চারি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। প্রথম, ব্রহ্মচর্য্য ; দ্বিতীয়, গার্হস্থ্য ; তৃতীয়, বানপ্রস্থ ; চতুর্থ, ভিক্ষু। 'ধর্ম্ম' ঃ—আচার।

পংক্তি ১৫। জনস্থান ঃ—দণ্ডকবনের অন্তর্গত প্রদেশ বিশেষ। দণ্ডকবন নর্ম্মদা ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী ছিল। কথিত আছে দণ্ডকনামা নরপতি স্বীয় গুরু শুক্রাচার্য্যের শাপে দগ্ধ হয়েন ও তাঁহার রাজ্য অরণ্য হইয়া দণ্ডকারণ্য নাম প্রাপ্ত হয়।

'প্রস্রবণগিরি' ঃ—প্রস্রবণ নামক পর্ব্বত।

পংক্তি—১৫। 'জলধর পটল সংযোগে' ঃ—'জলধর' = মেঘ। 'পটল' = সমূহ। বিংশ সংস্করণের সীতার বনবাসে 'জলধর-পটল সংযোগে' এই সমাসবদ্ধ পদের স্থলে 'জলধর-মণ্ডলীর যোগে' এইরূপ বিচ্ছিন্ন পদদ্বয় দৃষ্ট হয়।

পৃষ্ঠা—৮।

পংক্তি ৫। 'পঞ্চবটী' ঃ—দণ্ডকবনের অংশবিশেষ। স্থানীয়

প্রবাদ এই যে, বর্ত্তমান নাসিক হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত পঞ্চবটী-নামক স্থলই প্রাচীন পঞ্চবটী।

'শূর্পণখা' ঃ—রাবণের ভগিনী। ইহার প্রতি কৃত অপমানের পরিশোধের জন্যই রাবণ সীতাহরণ করেন।

পংক্তি ১২। 'হিরণ্ময় মৃগের ছলে' ঃ—মারীচ নামক রাক্ষস স্বর্ণমৃগের আকার ধারণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণ উভয়কে তাহাদের পঞ্চবটীস্থ আশ্রম হইতে অনেক দূরে লইয়া যায়। তাহাদের অনুপস্থিতির সুযোগে রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া যান।

পংক্তি ১৫। 'আর্য্য' ঃ—'হইয়াছিলেন' ক্রিয়ার কর্ত্তা।

পৃষ্ঠা—৯।

পংক্তি ৫। 'হৃদয়ের মর্ম্ম গ্রন্থি' ঃ—হৃদয়ের সন্ধিস্থান। (সন্নিপাতঃ শিরাস্নায়ুসন্ধিমাংসাস্থিসম্ভবঃ। মর্ম্মাণি ; তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ॥)

পংক্তি ১১। 'পম্পা সরোবর' ঃ—কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমান 'পেন্নাইর' নদীই প্রাচীন পম্পা, কাহারও মতে এই নদীর উত্তরাংশে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের মধ্যে একটি সরোবরাকৃতি জলাশয় আছে, ইহাই পম্পা।

পৃষ্ঠা—১০।

পংক্তি ৮। 'মাল্যবান্' ঃ—ইহাও প্রস্রবণ গিরির নিকটবর্ত্তী কোনও ক্ষুদ্র পর্ব্বত ; কেহ কেহ এই দুইটিকেই এক পর্ব্বত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

জন্ম—১২২৭ সাল (১৮২০ খৃষ্টাব্দ); মৃত্যু—১২৯৩ সাল (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ)। জন্মস্থান—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চুপী গ্রাম। শৈশবকালে অক্ষয়কুমার গ্রাম্য বিদ্যালয়ে যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালা ও পার্শী শিক্ষা করেন, তৎপর খিদিরপুরে খৃষ্টান মিশনারীদের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে কিছুদিন পাঠ করিয়া, পরে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী নামক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া গৃহে বসিয়াই অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ইঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২৪৭ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে, অক্ষয়কুমার তথায় ভূগোল ও পদার্থ-বিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিন বৎসর পরে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রচারিত হয়; দ্বাদশবর্ষ কাল অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে তিনি কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। এই সময় হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে থাকে। ক্রমে তিনি শিরঃপীড়ায় অকর্ম্মণ্য হইয়া শেষজীবনে বালিগ্রামে 'মোহন-উদ্যান'-নামক বাগানবাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করেন।

অক্ষয়কুমার নিজ যত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বহুতর ইংরেজি সাহিত্যবিষয়ক ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করেন। তিনি কিঞ্চিৎ সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম ও নিরামিষাশী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলির মধ্যে 'চারুপাঠ' 'ধর্ম্মনীতি', 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' ও 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

পৃষ্ঠা—১১।

পংক্তি—১৮। 'কতখান মেঘ' ঃ—এই শব্দটি 'কয়েকখানা মেঘ' এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।—কতখান শব্দ এস্থলে সুপ্রযুক্ত হয় নাই।

পৃষ্ঠা—১২।

পংক্তি—৬। 'সমূহ' ঃ—এই শব্দ বিপুলায়তন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই অর্থে এই শব্দ কথিত ভাষায়ই অধিকতর প্রচলিত।

পংক্তি—১৮। 'মেঘ সমুদয়' ঃ—'সমুদয়' ও 'সমুদায়' এই দুই প্রকার রূপই শুদ্ধ ও প্রচলিত। অক্ষয়কুমার দুইটিই ব্যবহার করিয়াছেন। তারাশঙ্কর প্রভৃতি শুধু 'সমুদায়' প্রয়োগ করিয়াছেন।

পৃষ্ঠা—১৩।

পংক্তি—৫। 'সূর্য্য কিরণে' ইত্যাদি ঃ—পদার্থ-বিদ্যামতে সূর্য্য-কিরণ ৭টি বিভিন্ন বর্ণের সমষ্টি। (সহজে মনে রাখিবার জন্য এই বর্ণসমষ্টিকে ইংরাজিতে সংক্ষেপে Vibgyor বলা হয় ; এই শব্দটি Violet, (বেগুনে), Indigo, (গাঢ়নীল), Blue, (নীল), Green, (সবুজ), Yellow, (পীত), Orange, (কমলা), Red, (লাল), এই সাতটি বিভিন্নবর্ণ-বোধক শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া গঠিত)।

পংক্তি—৩। 'জল-কণাসমূহ' ঃ—সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'জলকণসমূহ' লিখিলে শুদ্ধ হইত। কণ শব্দ অকারান্ত ও পুংলিঙ্গ।

পংক্তি—৬। 'বহুকোণবিশিষ্ট কাচ' ঃ—ইংরাজিতে ত্রিকোণ কাচকে Prism কহে। ইহাই আলোকবিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

পংক্তি—১০। মেঘ হইতে বৃষ্টিবিন্দুর উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও নানা মত বৈজ্ঞানিকসমাজে প্রচলিত আছে। বস্তুতঃ এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক-গণ অদ্যাপি একমত হইতে পারেন নাই। সুবিখ্যাত অধ্যাপক পি,

টি, আর, উইলসন্ এ বিষয়ে নানা বৈজ্ঞানিকযুক্তিযুক্ত মত উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার ফল এস্থলে সবিস্তার উল্লেখ করা অসম্ভব।

পৃষ্ঠা—১৬।

পংক্তি—৫। 'বঙ্গীয় অখাত': 'অখাত' শব্দ 'দেবখাত' অর্থাৎ হ্রদাদি অকৃত্রিম জলাশয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়। এখানে বঙ্গীয় অখাত অর্থে বঙ্গোপসাগর বুঝিতে হইবে।

পৃষ্ঠা —১৯।

পংক্তি—৭। 'বুরুল';—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্ব্ব;—এক ইঞ্চি পরিমাণ। বর্ষমাণ যন্ত্র যোগে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত চেরা পুঞ্জি নামক পাহাড়ে বৎসরে ৫০০ বুরুল বৃষ্টিজল পতিত হয়, কলিকাতায় মাত্র ৬৫ ও লণ্ডনে ২৩।

পৃষ্ঠা—২০।

পংক্তি—২। 'রক্তবৃষ্টি':—হিন্দুশাস্ত্রে রক্তবৃষ্টি, ধান্যবৃষ্টি, পুষ্পবৃষ্টি প্রভৃতি নানারূপ বৃষ্টির ফল উল্লিখিত আছে। এগুলি অশুভদ্যোতক ঘটনা বলিয়া প্রাচীনেরা বিশ্বাস করিতেন। রক্তবৃষ্টি ভাবি-যুদ্ধবিগ্রহ-জ্ঞাপক।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন।

জন্মস্থান—নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁচকুলি গ্রাম। তারাশঙ্কর তর্করত্ন (চট্টোপাধ্যায়) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ঐ কলেজের লাইব্রেরীয়ান (গ্রন্থাধ্যক্ষ)-এর পদ লাভ করেন। তিনি ইংরাজি ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ

'কাদম্বরী'। তিনি ডাঃ জনসন প্রণীত রাসেলাস্ নামক ইংরেজি উপন্যাসও বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত সোমপ্রকাশ পত্রিকার লেখকশ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার বহু রচনা ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা—২১।

পংক্তি—১২। 'নরপতির' :—তাড়াপীড়ের।

পংক্তি—১৯। 'শুভলগ্ন' :—গ্রীক প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় হিন্দুগণেরও ফলিত-জ্যোতিষে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। কোনও শুভকর্ম্মই গণকোপদিষ্ট শুভ মুহূর্ত্ত ব্যতীত অন্য সময়ে সম্পন্ন হইত না। 'লগ্ন' :—রাশিদিগের উদয় কাল। অহোরাত্রের মধ্যে দ্বাদশ রাশির উদয় হয় বলিয়া অহোরাত্রে দ্বাদশটি লগ্ন কল্পিত হয়।

পৃষ্ঠা—২২।

পংক্তি—৩। 'পুরন্ধ্রী' :—পতিপুত্রবতী স্ত্রী। (পুর—ধৃ+খচ্ স্ত্রীলিঙ্গে ঈ)

পংক্তি—৪। 'ষষ্ঠীদেবীর' ইত্যাদি :—শিশুর জন্মদিন হইতে ষষ্ঠ দিনে বা একবিংশতিতম দিনে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিতে হয়। ("পূজা চ সূতিকাগারে পরা ষষ্ঠদিনে শিশোঃ॥ একবিংশদিনে চৈব পূজা কল্যাণহেতুকী।" মাতৃকাগণ :—মাতৃকাগণের সংখ্যা কাহারও মতে ১৬, কাহারও মতে ৮, কাহারও মতে ৭। ষষ্ঠীদেবীও একজন মাতৃকা বলিয়া কথিত। ষোড়শ মাতৃকার মধ্যে গৌরী, পদ্মা, শচী, সাবিত্রী, জয়া, বিজয়া, স্বাহা, স্বধা দেবীর নাম সাধারণের সুপরিচিত।

পংক্তি—১৬। 'চক্রবর্ত্তী' ইত্যাদি :—সার্ব্বভৌম নরপতি,—সম্রাট্। 'চক্র'—একসমুদ্র হইতে অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ।

পংক্তি—১৭। 'শঙ্খচক্ররেখা' :—শঙ্খচক্রাকার রেখা। হস্ত

পদাদি অঙ্গসমূহে অবস্থিত রেখা দ্বারা মনুষ্যের শুভাশুভাদি নির্ণয় করা যায় এ বিশ্বাস অদ্যাপি নানা সভ্য দেশে প্রচলিত আছে। (গরুড় পুরাণে এইরূপ শুভাশুভ নির্ণয় সম্বন্ধে সবিস্তার উপদেশ আছে ; ৬৩—৬৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

পৃষ্ঠা—২৩।

পংক্তি—১। 'নামকরণ' ঃ—'নামকরণ' 'চূড়াকরণ' (৩য় পংক্তি) প্রভৃতি আচার অদ্যাপি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। মনুর মতে বালকের জন্ম হইতে দশম বা দ্বাদশ দিনে অথবা তৎপরবর্ত্তী কোনও পুণ্যতিথি বা শুভলগ্নে নামকরণ করিতে হয়। 'চূড়াকরণ' প্রথম বা তৃতীয় বৎসরে কর্ত্তব্য। মনুসংহিতা ২য় অধ্যায় ৩০ ও ৩৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পংক্তি—২। 'চন্দ্রাপীড়' ঃ—চন্দ্র আপীড় অর্থাৎ শিরোভূষণ যাহার। মহাদেবের এক নামও 'চন্দ্রাপীড়'।

পংক্তি—৬। 'শিপ্রানদী' ঃ—তারাপীড়ের রাজধানী উজ্জয়িনী শিপ্রানদীর তীরে অবস্থিত ছিল। কালিদাসের কাব্যের নানা স্থানে শিপ্রা নদীর বর্ণনা আছে। (মেঘদূত, পূর্ব্বমেঘ, ৩২ শ্লোক, ও রঘুবংশ ষষ্ঠসর্গ, ৩৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) শিপ্রা অথবা সিপ্রা চম্বল নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা—২৪।

পংক্তি—৫। 'চন্দ্রোদয়ে' প্রভৃতি ঃ—তারাশঙ্করের রচনার বহু স্থলে এইরূপ উপমার আধিক্য আছে। (এক বিষয়ের বহু উপমা থাকিলে তাহাকে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে মালোপমা কহে। তারাশঙ্কর উৎপ্রেক্ষাদি অন্যান্য অনেক অলঙ্কারেরও প্রচুর প্রয়োগ করিয়াছেন।) বলা বাহুল্য এই উপমাগুলি মূল 'কাদম্বরী' কাব্যেও আছে।

পৃষ্ঠা—২৫।

পংক্তি—২১। 'কোন মহাত্মা শাপগ্রস্ত' ইত্যাদি ঃ—ইন্দ্রায়ুধ প্রকৃতপক্ষেই শাপগ্রস্ত তাপস-তনয়। এই তাপস-কুমারের নাম কপিঞ্জল। তাঁহার অপূর্ব্ব কাহিনী জানিতে হইলে সমগ্র 'কাদম্বরী' পাঠ করা আবশ্যক।

পৃষ্ঠা—২৬।

পংক্তি—৮। 'নেত্র উন্মীলন করিল' ঃ—এখানে নগরীকে মানুষী কল্পনা করিয়া গবাক্ষগুলিকে তাহার চক্ষু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

পংক্তি—৯। 'রমণীগণ...উৎসুকা' ঃ—নায়ককে দেখিবার জন্য নাগরীগণের এইরূপ ঔৎসুক্যবর্ণনা সংস্কৃত কাব্যের নানা স্থলে দৃষ্ট হয়। কালিদাসও দুই স্থলে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। (রঘুবংশ ৭ম সর্গ ৫—১৫ শ্লোক, ও কুমারসম্ভব ৭ম সর্গ ৫৬—৬২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

পংক্তি—১৮। 'পল্লবময়' ঃ—এইস্থানে পল্লব শব্দ নবোদ্‌গত পত্রের স্তবক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নূতন পাতার বর্ণ পাটল, এই জন্যই অলক্তক (আল্‌তা)-রঞ্জিত পায়ের চিহ্নের সহিত তাহার সাদৃশ্য কল্পনা অসঙ্গত হয় নাই।

পংক্তি—২১। 'চন্দ্রময়' ও 'পথ' ইত্যাদি ঃ— (এই স্থানে মূল কাদম্বরীতে ঈষৎ একটু বিভিন্নরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।) মুখের সহিত চন্দ্রের ও লোচনের সহিত নীলোৎপলের সাদৃশ্য।

পৃষ্ঠা—২৭।

পংক্তি—১২। 'বিলাসবতী' ঃ—চন্দ্রাপীড়ের জননী।

পৃষ্ঠা—২৮।

পংক্তি—১৭। 'সুরাপান' ইত্যাদি ঃ—সুরাপানেই লোকের মত্ততা হয় এবং চক্ষুর দোষেই অন্ধতা জন্মে ; কিন্তু বিষয়াসক্ত ব্যক্তি,

পানদোষ ও নেত্ররোগ না থাকিলেও ধনের গর্ব্বেই মত্ত (অর্থাৎ হিতাহিত-বিবেক-শূন্য) এবং অন্ধ (অর্থাৎ পরিণামদৃষ্টি-হীন) হন। 'মত্ত' ও 'অন্ধ' এই দুইটি শব্দের প্রত্যেকটী দুই অর্থ প্রকাশ করিতেছে, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক।

পৃষ্ঠা—২৯।

পংক্তি—৭। 'ইহার—তরঙ্গ' ঃ—যৌবরাজ্য প্রভৃতিকে এস্থলে নদীপ্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। যেমন সুদৃঢ় নৌকা না থাকিলে নিরাপদে তরঙ্গাকুল নদী পার হওয়া যায় না, সেইরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্যতীত যৌবরাজ্যাদিজনিত মোহ জয় করা যায় না।

পংক্তি—১১। 'উর্ব্বরা' ইত্যাদি ঃ—মূলে এই উদাহরণটী নাই, তৎপরিবর্ত্তে আছে,—"কিংবা প্রশমহেতুনাপি ন প্রচণ্ডতরীভবতি বাড়বানলো বারিণা।"

পংক্তি—১৫। 'দিবাকরের ইত্যাদি ঃ—এই সুপ্রসিদ্ধ উপমাটি তারাশঙ্কর ভবভূতি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কাদম্বরীতে এইরূপ আছে—"অপগতমলে হি মনসি স্ফটিকমনাবিব রজনিকরগভস্তয়ো বিশন্তি সুখমুপদেশগুণাঃ"। ভবভূতি লিখিয়াছেন, "প্রভবতি শুচি র্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ।" (উত্তরচরিত, দ্বিতীয় অঙ্ক, বিষ্কম্ভক।)

পংক্তি—১৮। 'বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে' ঃ—রঘুবংশেও এই ভাবের কথা আছে যথা "বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা।" (১ম সর্গ ২৩ শ্লোক)।

পৃষ্ঠা—৩০।

পংক্তি—১২। 'বৈদগ্ধ্য' ঃ—রসজ্ঞতা।

পংক্তি—১৫। 'মৃগয়া' ঃ—শাস্ত্রে মৃগয়া ব্যসন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায় ৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। মাইকেল

মধুসূদন দত্ত সীতামুখে রামচন্দ্রের মৃগয়ার কথা বর্ণনাকালে রামচন্দ্রের পক্ষে মৃগয়াভ্যাসের দোষটুকু এইরূপে পরিহার করিয়াছেন,—

"মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!" ৪র্থ সর্গ

মেঘনাদ বধ ৪র্থ সর্গ ১২৫—১২৮ পংক্তি। শকুন্তলা ২য় অঙ্কেও মৃগয়ার প্রশংসা আছে। "মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়া মীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ।"

পংক্তি—১৯। 'জগদীশ্বর':—তারাশঙ্কর হয়ত এস্থলে "দিল্লী-শ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই স্তুতিবাক্য স্মরণ করিয়াই 'জগদীশ্বর' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। মূল কাদম্বরীতে আছে,—

প্রতারণা কুশলৈ র্ধূর্ত্তৈরমানুষোচিতাভিঃ স্তুতিভিঃ প্রতার্য্য-মাণাঃ—ইত্যাদি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

কালীপ্রসন্ন কলিকাতা যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। উদারতা, দানশীলতা প্রভৃতি গুণে তিনি সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করিয়া তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। এই অনুবাদ কার্য্য ১২৬৫ সালে আরব্ধ হইয়া ১২৭৩ সালে সম্পূর্ণ হয়। কালীপ্রসন্ন স্বকৃত অনুবাদ বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে মহা-ভারতের এক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্নের অনুবাদ বর্দ্ধমান

'রাজবাটীর অনুবাদ অপেক্ষা প্রাঞ্জলতর। তাঁহার আর এক খানি গ্রন্থ—'হুতোম পেঁচার নক্সা'।

পৃষ্ঠা—৩২।

পংক্তি—১০। 'ধর্ম্মরাজ':—ধর্ম্ম শব্দ এ স্থলে পুণ্য বা ন্যায় বোধক। 'ধর্ম্মরাজ':—(ধর্ম্ম—রাজ্ + অচ্) পরমপুণ্যবান্ বা পরম-ন্যায়বান্। 'ধর্ম্মনন্দন':—ধর্ম্মপুত্র, যুধিষ্ঠির।

পংক্তি—১৫। সুখসংবর্দ্ধিতা:—সুখের ক্রোড়ে লালিতা। মূলে এ স্থলে 'সুখার্হা'—এই শব্দ আছে।

পৃষ্ঠা—৩৪।

পংক্তি—৩। 'ক্রোধবশ':—মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে 'ক্রোধবশ' এক শ্রেণীর দেবতার নাম। 'ক্রোধবশ' নামক দেবগণ বেদ বা পুরাণে তেমন প্রসিদ্ধ নহেন। কুকুরের অশুদ্ধি বিষয়ে মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায় ২৩৯ ও ২৪১ শ্লোকেও উল্লেখ আছে।

পৃষ্ঠা—৩৫।

পংক্তি—১২। 'দ্বৈতবনে':—এই ঘটনা মূল মহাভারতের বনপর্ব্ব ৩১০—৩১৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মনিষ্ঠা পরীক্ষার্থ স্বয়ং ধর্ম্ম মৃগরূপ ধারণ করিয়া ছলনাক্রমে পঞ্চপাণ্ডবকে তাঁহাদের আশ্রম হইতে দূরে লইয়া যান। তথায় পাণ্ডবগণ সকলেই তৃষ্ণার্ত্ত হইলে যুধিষ্ঠির নকুলকে জলান্বেষণে প্রেরণ করেন। অদূরে এক মায়াসরোবর ছিল; সেই সরোবর যক্ষরূপী ধর্ম্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত ছিল। নকুল সরোবরতীরে উপস্থিত হইলে যক্ষ তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর না করিয়া জল পান করিতে নিষেধ করেন। সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া জল পানে প্রবৃত্ত হইলে নকুলের মৃত্যু হয়। নকুলের বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির একে একে সকল ভ্রাতাকেই তাঁহার অনুসন্ধান জন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু

সকলেই ঐ মায়াসরোবর-তীরে উপস্থিত হইয়া নকুলের দশা প্রাপ্ত হন। অবশেষে যুধিষ্ঠির স্বয়ং তথায় আসিয়া যক্ষের সমুদায় প্রশ্নের উত্তর দান করেন।

পংক্তি—১৫। 'মাদ্রী' ঃ—যুধিষ্ঠিরের বিমাতা ও নকুল-সহদেবের জননী। যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ মৃত পাণ্ডবগণের মধ্যে মাত্র একজনকে জীবন দান করিতে ইচ্ছুক হইলে যুধিষ্ঠির বিমাতৃ-তনয় নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা—৩৬।

পংক্তি—২৩। 'মানুষভাব' ঃ—ভ্রাতৃগণ ও পত্নীর প্রতি মমতা।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

জন্ম—১২৩২ সাল (১৮২৫ খৃষ্টাব্দ) ; মৃত্যু—১৩০১ সাল (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ)। জন্মস্থান—কলিকাতা। ৮ বৎসর বয়সে ভূদেব সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন, তথায় ৩ বৎসর কাল পাঠ করিয়া দুইবৎসর অন্যান্য স্কুলে ইংরেজি অধ্যয়নপূর্ব্বক হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। তথায় ৬ বৎসর পাঠ করিয়া শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। ভূদেবচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহাধ্যায়ী ও কলেজের একজন অতিশয় প্রতিভাশালী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথমে চন্দননগরে স্বল্প বেতনে শিক্ষকতা করেন, শেষে ক্রমে মাদ্রাসা কলেজের ইংরেজির ২য় শিক্ষক, হাবড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ও বিদ্যালয় সমূহের সহকারী ইন্‌স্পেক্টর ও শেষে বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সি আই, ই, উপাধিতে ভূষিত ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য

নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কিছুদিন কাশীধামে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজবাসস্থল চুঁচুড়াতে এক টোল স্থাপন করেন, ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণের নামে এক সংস্কৃতশিক্ষা-ভাণ্ডার স্থাপন কল্পে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দান করেন।

ভূদেবচন্দ্র কিছুদিন 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদকতা করেন, ও 'শিক্ষাদর্পণ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ ঃ— 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', 'পুষ্পাঞ্জলি,' 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', ও 'বিবিধ প্রবন্ধ'। এতদ্ব্যতীত তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণের জন্য ইতিহাস ও বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা—৩৮।

পংক্তি—১৭। 'সম্মিলিত পরিবারের'ঃ—একান্নবর্ত্তী পরিবারের। ভূদেবচন্দ্র হিন্দুসমাজের পারিবারিক রীতিনীতি ও হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত আচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

পৃষ্ঠা—৩৯।

পংক্তি—১। আস্তবলঃ—ইহা ইংরেজি stable শব্দের অপভ্রংশ। অশ্বশালা।

পংক্তি—১৩। 'বাহির হইতে'ঃ—সমাজ দ্বারা।

পৃষ্ঠা—৪০।

পংক্তি—৭। 'শোকবিহ্বল'ঃ—ইত্যাদি। শোকের সময়ে মানসিক অস্থিরতা হেতু হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য জন্মে।

সেই জন্য সে সময়ে রক্ত বা রক্ত হইতে উৎপন্ন স্তন্যদুগ্ধ ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। তাহা আংশিকরূপে বিষাক্ত হয়।

পংক্তি—২১। 'এ পক্ষ' ঃ—হাস্য কৌতুকাদি।

পৃষ্ঠা—৪১।

পংক্তি—৭। 'তন্মনস্ক' ঃ—তদ্‌গতমনাঃ—অর্থাৎ অত্যন্ত নিবিষ্ট-চিত্ত।

পংক্তি—১৪। 'চুলবুলে' ঃ—অস্থির, অব্যবস্থিত।

পংক্তি—১৭। 'ধ্যানগম্য' ঃ—ধ্যান বা একাগ্র চিন্তা দ্বারা যাহা উপলব্ধি করা যায়। 'ইষ্টমূর্ত্তি'—পূজনীয় দেবতার মূর্ত্তি।

পৃষ্ঠা—৪২।

পংক্তি—২৩। পীড়ার প্রকৃতি' ঃ—সংক্রামক পীড়ায় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

জন্ম—১২৪৫ সাল (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ); মৃত্যু—১৩০০ সাল (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ)। জন্মস্থান—চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠারম্ভ করিয়া ৮ বৎসর বয়সে মেদিনী-পুর স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি স্বশ্রেণীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরি-চিত ছিলেন। ১৮৫১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি মহম্মদ মহসীন কলেজে প্রবেশ করেন; তৎপরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে বি, এ, ও বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্রও

পিতার ন্যায় ডেপুটী কালেক্টরি পদ লাভ করেন ও ঐ পদে থাকিয়া অস্থায়িভাবে স্বল্পকালের জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারীর পদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র 'ললিতা মানস' নামে একখানা কবিতাপুস্তক রচনা করেন। তৎপরে ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড (Indian Field) নামক পত্রিকায় এক ইংরেজি উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ঐ পত্রিকাখানি উঠিয়া যাওয়ায় তাঁহার উপন্যাস সম্পূর্ণ হয় নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহার দেশবিখ্যাত উপন্যাসগুলি ও অন্যান্য রচনা প্রকাশ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে (১২৭৯ সালে) তিনি 'বঙ্গদর্শন' নামে মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকা বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নবযুগের প্রবর্ত্তনা করে। তদানীন্তন সাহিত্যরথিগণের প্রায় সকলেরই 'হাতে খড়ি' এই বঙ্গদর্শনেই হয়।

বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী সকলেরই পরিচিত। তাঁহার 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী', 'সীতারাম', 'রাজসিংহ', 'মৃণালিনী' প্রভৃতি বাঙ্গালা উপন্যাসের শীর্ষস্থানীয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও প্রতিভার পরিচায়ক। সুযোগ্য রাজকর্ম্মচারী ও বাঙ্গালাসাহিত্য-মণ্ডলের একচ্ছত্র সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রকে গবর্ণমেণ্ট 'রায় বাহাদুর' ও 'সি, আই, ই' উপাধিতে মণ্ডিত করিয়া তাঁহার যোগ্যতা ও প্রতিভার সম্মান করিয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা—৪৫।

পংক্তি—১৩। 'মরিলে' ইত্যাদি ঃ—লোকের স্বভাব এই যে, যাহা

হেয় ও অপ্রীতিকর তাহার কল্পনা করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে এবং তাহার সম্ভবের বিরুদ্ধে যত যুক্তি আছে মনে মনে তাহারই আবৃত্তি করিতে ও তাহার উপরই হৃদয়ের আস্থা স্থাপন করিতে চায়।

পংক্তি—২২। 'নয়নস্নিগ্ধকর' 'মনোমুগ্ধকর' প্রভৃতি প্রয়োগ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে একটু কষ্টকল্পনা করিয়া সমর্থন করিতে হয়। 'নয়নস্নেহকর' ও 'মনোমোহকর' লিখিলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে শুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সুন্দর হয় না। শুদ্ধ ভাষায় ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তাহা প্রকারান্তরে ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য।

পৃষ্ঠা—৪৬।

পংক্তি—৩। 'ক্রমে' ইত্যাদি ঃ—প্রথমে জ্যোতির্ম্মণ্ডল দর্শন, পরে ক্রমে ক্রমে তাহাতে দেবীমূর্ত্তি ও নিজ মাতার মূর্ত্তি স্পষ্টরূপে দেখার বর্ণনা কতকটা সংস্কৃত শিশুপাল বধ কাব্যের প্রথমসর্গে বর্ণিত নারদের আকাশ হইতে অবতরণের অনুরূপ।

(চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিম্।
বিভু র্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ ॥)

হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র এই বর্ণনা স্মরণ করিয়াই বর্ণ্যমান বিষয়ের এইরূপে অবতারণা করিয়াছেন।

পংক্তি—২১। 'বেলাবিহীন' ঃ—এ স্থলে এই শব্দ 'যাহার বেলা বা সীমা দেখা যায় না' এইরূপ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

পৃষ্ঠা—৪৭।

পংক্তি—১। 'অনাহ্লাদজনিতবৎ ভ্রূকুটিবিকাশ' ঃ—অনাহ্লাদজনিত=বিষাদজনিত। তাঁহার মুখবিকার দর্শনে বোধ হইল যেন তিনি কুন্দনন্দিনীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন।

পংক্তি—২। 'অঙ্গুলিসঙ্কেতনীত-নয়নে' ঃ—অর্থাৎ আমি যেদিকে

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছি সেইদিকে দৃষ্টি চালনা করিয়া। নীত=প্রেরিত।

পংক্তি—২০। জলবুদ্‌বুদবৎ' ঃ—বুদ্‌বুদ যেমন জলেই উৎপন্ন হইয়া স্বল্পকাল মধ্যে ও নিঃশব্দে জলেই বিলীন হয় সেইরূপ সেই মনুষ্যমূর্ত্তি আকাশে ক্ষণকালের জন্য বিরাজমান থাকিয়া আকাশেই বিলীন হইল। সেক্‌সপিয়ারের ম্যাক্‌বেথ্‌ নাটকে এই ভাবের অনুরূপ কথা আছে ঃ— *

পৃষ্ঠা—৪৮।

পংক্তি৩। 'উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী ঃ—এই স্ত্রীলোকটির নাম হীরা। আর পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষের নাম নগেন্দ্রনাথ।

পংক্তি—২০। 'বঙ্গদেশের সাহিত্যে' ঃ— সকল দেশের সাহিত্যেই চন্দ্র চিরদিন কবিগণের প্রিয়। তবে হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা দেশে আদিরসাত্মক কাব্যের প্রাচুর্য্য স্মরণ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন।

পৃষ্ঠা—৪৯।

পংক্তি— ১। 'উলটি পালটি খাইয়াছেন' ঃ---অর্থাৎ চন্দ্রের বর্ণনা, চন্দ্রের সঙ্গে সুন্দর পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মুখাদি অবয়বের তুলনা প্রভৃতি ভাল-মন্দ সকল শ্রেণীর কাব্যে স্থানে অস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে।

পংক্তি---৪। 'অনুপ্রাসে' ঃ—'অনুপ্রাস' একপ্রকার অলঙ্কারের নাম। কাব্যের বৈচিত্র্যের নাম অলঙ্কার। একবর্ণের পুনঃ পুনঃ

---

* Banquo : The earth hath bubbles, as the water has,
And these are of them.—Whither are they vanished ?
Macbeth : Into the air ; and what seem'd corporal, melted
As breath into the wind.

Macbeth, Act I Sc. iii, 79-82

প্রয়োগের নাম অনুপ্রাস ("বৈচিত্র্যমলঙ্কারঃ।" "বর্ণসাম্যমনুপ্রাসঃ।" "অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ।") প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে অনুপ্রাস অলঙ্কারের অতিরিক্ত প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়।

পংক্তি---৭। 'বিজ্ঞান-দৈত্য' ইত্যাদি:---উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের এত বেশি চর্চ্চা হইয়াছে যে, এ কালের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কোন বিষয়ের কাল্পনিক বর্ণনা লইয়া সন্তুষ্ট নহেন। সকল কথাই তাঁহারা বিজ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা করিয়া লইতে ইচ্ছা করেন। পাশ্চাত্যদেশে—যেখানে এই বিজ্ঞান চর্চ্চা সমধিকরূপ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে তথায়—বর্ত্তমান কালীন কবিগণও তাঁহাদের বিজ্ঞানসম্বন্ধিজ্ঞান কাব্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি কল্পে নিয়োগ করিয়াছেন। *

পংক্তি—৯। 'অভিমন্যু:—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ও কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার তনয়। ইনি অপ্রাপ্তযৌবনাবস্থায়ই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া পতিত হন।

ভদ্রার্জ্জুন = ভদ্রা (সুভদ্রা) + অর্জ্জুন। অভিমন্যু চন্দ্রের অংশাবতার ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পরে চন্দ্রলোকগমনরূপ সান্ত্বনাবাক্য বস্তুতঃ ভদ্রার্জ্জুনের প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই; কিন্তু ব্যাসদেব কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনার্থ উল্লিখিত হইয়াছিল। মূল মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব, ৬৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। "তামৈন্দবী মাত্মতনুং দ্বিজোচিতাং গতোঽভিমন্যুর্ন স শোক মর্হতি।

---

* যথা, Tennyson :

"Before the little ducts began
To feed thy bones with lime". (*The Two Voices*)
"Still, as while Saturn whirls, his steadfast shade
Sleeps on his luminous ring." (*The Palace of Art*).
"Star to star vibrates light" (*Aylmer's Field*)

পংক্তি—১৪। 'হীরার সরবত' ঃ—মিশর দেশের রাণী ক্লিওপেট্রার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি রোমীয় বীর এ্যাণ্টনিকে মুক্তার সরবত পান করিতে দিয়াছিলেন। *

পংক্তি—১৯। 'সৌর জগৎ' ঃ—সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণশীল গ্রহমণ্ডলী।

পৃষ্ঠা—৫০।

পংক্তি—১। 'কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত' ঃ—চন্দ্রকে পৃথিবীর অংশবিশেষ বলিলেও চলে। ইহা একটি গৌণগ্রহ বা Secondary planet. সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় বস্তুতঃ পৃথিবীর কেন্দ্র তাহার সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিবার রেখায় বা কক্ষে থাকে না, কিন্তু পৃথিবীও চন্দ্র এই যুক্ত গোলকদ্বয়ের যে ভারকেন্দ্র তাহাই ঐ কক্ষের উপর থাকে।

পংক্তি—৩। 'ইহার ব্যাস' ঃ—আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে চন্দ্রের ব্যাস ২১৬০ মাইল ও পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৬ মাইল। সুতরাং চন্দ্রের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের কিঞ্চিৎ অধিক এ সিদ্ধান্ত অবিসংবাদিতই রহিল।

পংক্তি—৬। 'গাগনিক গণনায়' ঃ—আকাশের অসীমতা ও গ্রহনক্ষত্রাদির পরস্পরের মধ্যে সাধারণতঃ যেরূপ দূরত্ব অনুমিত হয় তত্তুলনায়।

পংক্তি—১৬। 'চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে' ঃ—অর্থাৎ অনুমানাদির উপর নির্ভর না করিয়া দূরবীক্ষণ সাহায্যে দর্শন করিলে। প্রমাণ নানা

---

* In one of the feasts she (Cleopetra) gave to Antony at Alexandria, she melted pearls in her drink to render her entertainment more sumptuous **and** expensive.————*Lempriere.*

প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমান, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির সাক্ষ্য ইত্যাদি। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ঘটিত প্রমাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় ভেদে প্রত্যক্ষও নানাপ্রকার। তন্মধ্যে চক্ষুর্দ্বারা ঘটিত প্রত্যক্ষ 'চাক্ষুষ' প্রত্যক্ষ।

পংক্তি—১৮। 'আগ্নেয় গিরি' ঃ—চন্দ্রলোকে তিন প্রকার পর্ব্বত আছে। (১) পর্ব্বত-শ্রেণী, (২) শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন, একাকী দণ্ডায়মান পর্ব্বত, (৩) শিখরে চন্দ্রাকার গভীর গুহাযুক্ত পর্ব্বত।

পৃষ্ঠা—৫১।

পংক্তি—৫। 'কালিমাপূর্ণ' ঃ—কালিমা (কালিমন্ শব্দ)—মলিনতা। কাল+ইমনিচ্। 'কালিমন্' শব্দ ও 'পূর্ণ' শব্দে সমাস করিলে সমাসবদ্ধ পদ 'কালিমপূর্ণ' হওয়া উচিত।

পংক্তি—৬। 'মৃগ' ঃ—চন্দ্রের কলঙ্ক সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে নানারূপ মত প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, চন্দ্রদেব সর্ব্বদা একটি 'মৃগ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন। (এই প্রসিদ্ধি অবলম্বন করিয়া মাঘ কবি লিখিয়াছেন, "অঙ্কাধিরোপিতমৃগ শ্চন্দ্রমা মৃগলাঞ্ছনঃ"।—শিশুপালবধ, ২য় সর্গ ৫৩ শ্লোক।) অপর মত এই যে, পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে পতিত হওয়াতে তাহা মলিন দেখায়, ঐ মলিনতা মৃগাকার বলিয়া মৃগভ্রম জন্মে। এই মতের উল্লেখ 'হরিবংশ' নামক পুরাণে পাওয়া যায়।

পংক্তি—৭। 'কদমতলায় ইত্যাদি ঃ—এই মত শিশুগণের প্রবোধার্থ দিদিমা, বা তৎশ্রেণীর শিশুচিত্ত-বিনোদন কাব্যের প্রণেত্রী-গণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়া "চাঁদের মা-লো বুড়ী" প্রভৃতি ছড়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বুড়ী কাহারও মতে "চাঁদের মা", কাহারও মতে কোনও পতিপুত্রহীনা নারী। "কদম' গাছটির অস্তিত্ব ও সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কাহারও মতে ঐ গাছটি বট গাছ।

পংক্তি—৯। 'মানচিত্র' ঃ—ম্যাড্‌লার ও ডর্পাট নামক জ্যোতির্ব্বিদ্‌দ্বয় চন্দ্রের অতি সুন্দর মানচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

পংক্তি—১৫। "আন্দিস" ইত্যাদি ঃ— আন্দিস পর্ব্বত দক্ষিণ আমেরিকায়; ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ একঙ্কাগুয়ার উচ্চতা ২৩,০৮০ ফুট। হিমালয় পর্ব্বতের অনেক গুলি শৃঙ্গের উচ্চতাই ২৫,০০০ ফুট হইতে অধিক। এভারেষ্ট শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯০০২ ফুট, কাঞ্চন-জঙ্ঘার ২৮১৫৬ ফুট, ধবলগিরির ২৬৮২৬ ফুট।

পংক্তি—১৯। 'চিম্বারোজা' ঃ—ইহার উচ্চতা ২০৪৯৮ ফুট। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ইকোয়েডারপ্রদেশে স্থিত।

পৃষ্ঠা—৫২।

পংক্তি—১। 'বিশাল রন্ধ্র সকল' ঃ—এগুলি পূর্ব্বোক্ত ৩য় শ্রেণীর পর্ব্বত। এক একটি রন্ধ্রের ব্যাস ৫০।৬০ মাইল পর্য্যন্তও আছে। ইহাদের একটির নাম টাইকো (Tycho)।

পংক্তি—১৪। 'পশ্চাদ্‌ ভাগ দিয়া গতি' ঃ—ইহার বৈজ্ঞানিক নাম সমাবরণ—occultation.

পংক্তি—২৩। 'নিবিয়া যায়"—অদৃশ্য হয়।

পৃষ্ঠা—৫৩।

পংক্তি—৫। 'বর্ণরেখা পরীক্ষক যন্ত্র' ঃ—ইহার ইংরাজী নাম Spectroscope. জ্যোতিষ্মান্‌ পদার্থ সমূহের উপাদাননির্ণয়ার্থ তাহাদের জ্যোতিঃ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার যন্ত্র।

পংক্তি—৬ ঃ—'জলও নাই বায়ুও নাই' ঃ—আমরা চন্দ্রের কেবল এক দিক মাত্র দেখিতে পাই; অপর দিক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেকে বলেন যে চন্দ্রের ভারকেন্দ্র ঐ অপর দিকে অবস্থিত বলিয়া জলও বায়ু ঐ দিকে থাকে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয়

করিয়া বলা যায় না। অপর দিকে জল-বায়ু থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পংক্তি—১৬। 'পাক্ষিক চান্দ্র দিবস' ঃ—অর্থাৎ পৃথিবীতে যে সময়ে এক পক্ষ হয় তৎপরিমাণসময়-ব্যাপী দিবস। 'চান্দ্র'—চন্দ্র মণ্ডলে যাহা আছে।

পংক্তি—২২। 'লর্ড রস' ঃ—মনুষ্টার টেলিস্কোপ নামক সুবৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নির্ম্মাতা আরল্ অব্ রসের পুত্র।

পৃষ্ঠা—৫৪।

পংক্তি—১০। 'শব্দহীন' ঃ— চন্দ্র মণ্ডলে বায়ু নাই বলিয়া তথায় শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব।

পংক্তি—১১। 'এইজন্য' ইত্যাদি ঃ—বিজ্ঞান ও কাব্যের মধ্যে কল্পিত বিরোধের বিষয় এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে আভাসে বলা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, কাব্য ও বিজ্ঞানের এই বিরোধে বিজ্ঞানই জয়ী। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের প্রকৃত গৌরব হানির তেমন কোনও গুরুতর আশঙ্কা নাই।

পংক্তি—১৩। 'কাব্য গড়ে' ইত্যাদি ঃ—কাব্যের উদ্দেশ্য—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, তাহা অলীক পদার্থকেও কল্পনার ইন্দ্রজালতুল্য শক্তি দ্বারা প্রকৃতবৎ প্রতীয়মান করিয়া তুলে ; * আর বিজ্ঞান সত্যানুসন্ধান

* যথা—Shakespeare :

And, as imaginatin bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation, and a name.

Midsummer Night's Dream Act V, Scene i, 12—17

চেষ্টায় যাহা সুন্দর হইলেও অলীক, তাহার মায়াময় আবরণ উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য লোপ করিয়া দেয়। *

কিন্তু এই মতের যাথার্থ্য সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

জন্ম ১২৫০ সাল (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ), মৃত্যু—১৩১৭ সাল (১৯১০ খৃষ্টাব্দ)। জন্মস্থান—ঢাকাজেলার অন্তর্গত ভরাকর (বিক্রমপুর) গ্রাম। বাল্যকালে কালীপ্রসন্ন গৃহে কলাপব্যাকরণ ও কিঞ্চিৎ পার্শী পাঠ করিয়াছিলেন ও পরে বরিশালে এক রোমান্ ক্যাথলিক পাদরীর স্কুলে ইংরাজি পাঠ করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। কালীপ্রসন্ন বিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং স্কুলে থাকা কালেই নানা সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন ও বাঙ্গালাভাষায় প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া লোকের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। স্কুল ত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতায় থাকিয়া সবিশেষ উৎসাহসহকারে ইংরাজি সাহিত্য, দর্শনাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তথায় তিনি একদিন ভবানীপুরে এক সভায় বক্তৃতা করিয়া নিজের বাগ্মিতা শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং তৎপর তিনি এই শক্তির অনুশীলন করিয়া ক্ষমতাশালী বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন ২২ বৎসর বয়সে ঢাকা ছোট

---

* এই মত অবলম্বন করিয়াই Macaulay লিখিয়াছেন

"As civilisation advances, poetry almost necessarily declines". (Essay on Milton).

আদালতে একটি চাকরি গ্রহণ করেন এবং এই সময় হইতে গ্রন্থ রচনা ও বক্তৃতা করিতে থাকেন। এই সময় হইতে তাহার 'বান্ধব' পত্রিকাও প্রকাশিত হইতে থাকে। বান্ধবের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। বান্ধব যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। উত্তর কালে তিনি ভাওয়াল রাজসরকারে ম্যানেজারের পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহা ত্যাগ করেন। ভাওয়ালে চাকরীর সময় 'বান্ধব' বিলুপ্ত হয়। চাকরী ত্যাগ করিয়া তিনি 'বান্ধব' পত্রিকা পুনরায় প্রচার করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু এই নব-পর্য্যায় বান্ধবের জীবন বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

কালীপ্রসন্নের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি এইঃ—'প্রভাতচিন্তা', 'নিশীথ-চিন্তা', 'নিভৃতচিন্তা'. 'ভ্রান্তিবিনোদ', 'ভক্তির,জয়' 'প্রমোদলহরী', 'জানকীর অগ্নিপরীক্ষা', 'মা না মহাশক্তি' ইত্যাদি। গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী উভয়েই কালীপ্রসন্নের যোগ্যতার পুরস্কার করিয়াছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে 'রায় বাহাদুর', 'সি, আই, ই,' এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা—৫৫।

পংক্তি—২১। 'আকণ্ঠবিসর্পি বেষ্টনবদ্ধ'ঃ—কণ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেষ্টনে বদ্ধ অর্থাৎ লতার বেষ্টনে কণ্ঠ পর্য্যন্ত জড়িত।

পংক্তি ২২। 'গরিমার...বিলাসভঙ্গি'ঃ—'গরিমা' = উচ্চতা, বিশালতা। 'বিলাস' = শোভা। 'বিলাস' শব্দ অনেক সময়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির শোভাকরী চালনা অর্থে স্ত্রীলোকসম্পর্কে প্রযুক্ত হয়। এস্থলে 'গরিমা' পাদপের, ও 'বিলাস' লতার—এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে

পৃষ্ঠা—৫৬।

পংক্তি—৫। 'আগ্রার তাজ' ঃ—তাজ বা তাজ মহলের পূর্ণ নাম মুমৃতাজ মহল। মোগলসম্রাট সাজেহানের প্রিয় মহিষীর নামানুসারে ইহার নামকরণ হয় ও ইহা তাঁহারই অনুরোধ ক্রমে তাঁহার সমাধির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থাপত্য শিল্পে, সৌন্দর্য্যে ও উপাদানের বহুমূল্যতায় ইহা ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়।

Elphinstone's History of India P. ,588 foot-note দ্রষ্টব্য।

১৬৩১ খৃষ্টাব্দে মুমতাজের মৃত্যু হয়, সেকালে স্ফটিক প্রস্তরাদি অত্যন্ত সুলভ ছিল, তথাপি তাজমহল নির্ম্মাণে ৩১৭৪৮০২৪ টাকা খরচ হয়। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক টাভার্ণিয়ার ইহার নির্ম্মাণের আরম্ভ ও সমাপ্তি দেখিয়াছিলেন।

মিশরের পিরামিড্ ঃ—মিশর দেশ আফ্রিকায় ইহার অপর নাম ইজিপ্ট। পিরামিড্ গুলি অতি প্রাচীন ও অত্যুচ্চ প্রস্তরময় সমাধি-স্তম্ভ। ইহার গর্ভে প্রাচীন রাজগণের মৃতদেহ নিহিত আছে। এক একটি পিরামিড্ অতি বিস্ময়কর প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহাদের কোন কোনটি (যথা মেদুমের পিরামিড্) খৃষ্টের জন্মের ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাইরো সহরের নিকটবর্ত্তী চিওপ্সের পিরা-মিড্ মিশর দেশে বৃহত্তম। ইহাতে ৯ কোটি ঘনফুট প্রস্তর আছে। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানকালে ঐরূপ একটি পিরামিড নির্ম্মাণ করিতে ৪৫ কোটি টাকা আবশ্যক।

পংক্তি—২০। 'আবর্ত্তগতি' ঃ—একের জন্ম অপরের মৃত্যু, আবার অপরের জন্ম এইরূপ ভাব। 'আবর্ত্ত'—জলের ঘূর্ণি, "আবর্ত্তঃ অম্ভসাং ভ্রমঃ।" (আপাততঃ মনে হয় একই জীবের জন্মের পর মৃত্যু, আবার

জন্ম এইরূপ পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্ত্তন অর্থে এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, বস্তুতঃ প্রকরণ দৃষ্টে সেরূপ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না।)

পৃষ্ঠা—৫৭।

পংক্তি—৪। 'নির্ব্বাণ না তিরোধান' ঃ—'তিরোধান' অর্থে অদর্শন মাত্র বুঝায়, কিন্তু ঐকান্তিক বা নিঃশেষ ধ্বংস বুঝায় না। নির্ব্বাণ শব্দ শেষোক্ত অর্থে প্রযুক্ত হয়।

পংক্তি—২০। 'বাল্মীকির আশ্রম ঃ—ইহা তমসা নামক নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই নদী বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত।

পৃষ্ঠা—৫৮।

পংক্তি-১০। 'পৌরব ও যাদব' ঃ—পুরুবংশ ও যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ। পুরুবংশে দুষ্মন্ত, ভরত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন (মহাভারত আদিপর্ব্ব ৯৪ ও ৯৫ অধ্যায়ে পুরুবংশের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।) যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

পংক্তি-১১। 'বিক্রম'ঃ—বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন। 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি মাত্র, ইহা ভারতবর্ষে—নানা সময়ে নানা নৃপতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। প্রাচীন কিম্বদন্তী সমূহে যে বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ দেখা যায় ও কালিদাসাদি নবরত্ন যাহার সভা অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন বলিয়া কথিত হয়, তাঁহার প্রকৃত নাম কি ও তিনি কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে মত ভেদ আছে। অনেক পণ্ডিতের মতে উজ্জয়িনীরাজ যশোধর্ম্মদেবই—প্রকৃত বিক্রমাদিত্য। ইনি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন এবং শকজাতিকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। এইমতে মালবস্থিত্যব্দ নামক খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দ হইতে প্রচলিত প্রাচীন অব্দকে তিনি নিজ নামানুসারে বিক্রম সংবৎ বলিয়া প্রচলিত করেন।

'কালিদাস',ঃ—সংস্কৃত সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠকবি। ইঁহার রঘুবংশ, 'কুমার সম্ভব', 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা', 'বিক্রমোর্ব্বশী', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ ইউরোপেও আদৃত হইয়াছে।

পংক্তি-১২। 'কৌরব' ঃ—কুরুবংশীয়-ক্ষত্রিয়গণ। 'মহাভারত' প্রধানতঃ কুরুবংশেরই ইতিহাস।

পংক্তি-১৩। 'অভিমানদগ্ধ কুরুরাজ' ঃ—দুর্যোধন। ইনি দ্যুতে জয়লাভ করিয়া নিজ জ্ঞাতি পাণ্ডবগণকে বনে প্রেরণ করেন। বন বাসান্তে তাঁহারা স্বীয় রাজ্যপ্রার্থনা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "বিনা-যুদ্ধে সূচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমিও দিব না"। এইরূপ অন্যায় "অভিমানের" ফলে তিনি ভ্রাতৃ, বন্ধু, ও পুত্রগণ সহ যুদ্ধে নিহত হন।

পৃষ্ঠা—৫৯।

পংক্তি-১৪। 'ময়ূর সিংহাসন' ঃ—এই বিখ্যাত সিংহাসন মোগল সম্রাট সাজেহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সিংহাসন প্রচুর মণি মাণিক্যে খচিত ছিল। ইহার নির্ম্মাণে প্রায় ৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়।

পংক্তি-১০। 'আকবর সাহ' ঃ—দিল্লীর দ্বিতীয় ও রাজোচিত গুণা-বলীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট। জন্ম—১৫৪২ খৃঃ, মৃত্যু—১৬০৫ খৃঃ। সেকেন্দরা তাঁহার সমাধিমন্দির। ইহা দর্শন করিলে মোগল সাম্রাজ্যের অতীত সমৃদ্ধির কথা স্মরণ হয় বলিয়া ইহাকে "বিলুপ্ত সম্পদের স্মরণস্তম্ভ" বলা হইয়াছে।

পংক্তি-১৪। 'কপিল' ঃ—সাংখ্যদর্শন প্রণেতা। ইনি আদি বিদ্বান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। 'কণাদ' ঃ—বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা। 'নিউটন' ঃ—সার আইজাক নিউটন। জন্ম, ১৬৪২ ও মৃত্যু ১৭২৭ খৃঃ। ইনি মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গণিত ও পদার্থ বিদ্যায় ইনি

ইংলণ্ডে অদ্যাপি বিজ্ঞতম ব্যক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন। তাঁহার জ্ঞান ও বিনয় উভয়ই অসীম ছিল। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ প্রিন্সিপিয়া।

পংক্তি-১৫। 'হামবোল্ড' ঃ—জার্ম্মাণ দেশীয় বিখ্যাত পর্য্যটক ও বৈজ্ঞানিক। জন্ম, ১৭৬৯, মৃত্যু ১৮৫৯ খৃঃ। ইনি নানা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করেন ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া তথাকার ভূগোল, ভূবিদ্যা, খনিবিদ্যা, প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। *

পংক্তি-২০। 'হেলেনা' ঃ—গ্রীসের অন্তর্গত স্পার্টা রাজ্যের রাজা টিণ্ডেরাসের কন্যা ও মিনেলেয়াসের পত্নী। তাঁহার সমসাময়িক রমণী-গণের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ট্রয়রাজ প্রায়ামের পুত্র প্যারিস তাঁহাকে অপহরণ করিয়া স্বদেশে লইয়া যায় (খৃঃ পূঃ ১১৯৮)। গ্রীক কবি হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াদ্ তাঁহারই উদ্ধার চেষ্টার ইতিহাস।

পৃষ্ঠা-৬০।

পংক্তি-৩। 'গার্গি'ঃ—নিভৃত-চিন্তায় গার্গি এই শব্দ হ্রস্ব-ইকারান্ত করিয়াই মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা বোধ হয় মুদ্রাকরপ্রমাদ। বৃহদার-ণ্যক উপনিষদে গার্গী নাম্নী এক বিদুষী রমণীর ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে পরমার্থ তত্ত্বের আলোচনার কথা বর্ণিত আছে। (বৃহদারণ্যক তৃতীয় অধ্যায় অষ্টম ব্রাহ্মণ)।

'নচিকেতা' ঃ—ইনি বাজশ্রবস মুনির পুত্র, পিতার ক্রোধে যমালয়ে গমন করিয়া তথায় যমের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। ইঁহার বৃত্তান্ত কঠোপনিষদে আছে।

তাঁহার প্রধান গ্রন্থগুলি এই ঃ—* 'Kosmos', 'Chemical Analysis of the Atmosphere', 'Central Asia', 'Pictures of Nature', 'Travels'.

'জ্ঞানের প্রথম অভ্যুদয়ে':—আর্য্যজাতির ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের উদয়াবস্থায়।

পংক্তি—১৭। 'অনুবীক্ষণে অনুমেয়' ইত্যাদি:—এস্থলে 'অনুমেয় হয় না' কথা সুপ্রযুক্ত হয় নাই। কেননা পরবর্ত্তী 'প্রত্যক্ষবাদী' শব্দ হইতে বুঝা যায় যে, অনুবীক্ষণ দ্বারা যে পরীক্ষা তাহাও প্রত্যক্ষ-দর্শনই বটে, অনুমান নহে, এবং হইতেও পারে না।

প্রত্যক্ষবাদী':—যিনি প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোনও প্রমাণ মানেন না।

পংক্তি—২১। 'কিছুরই':—বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, জড় পদার্থের ধ্বংস নাই। 'বিনাশ' শব্দের প্রকৃত অর্থ অদর্শন। এস্থলে উহা ধ্বংস অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা—৬২।

পংক্তি—৮। 'সূক্ষ্মালোকদর্শিনী ভক্তি'—ভক্তিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, শুধু জ্ঞানচর্চ্চায় যে সত্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, ভক্তিবলে তাহা মনুষ্যের জ্ঞানের বিষয় হয়।

পংক্তি—১২। 'মা ভৈষীঃ':—ভয় করিও না; ভয় নাই।

পংক্তি—১৫। 'ভালবাসার বাগুরা':—ভালবাসার জাল, কপট ভালবাসা। 'বাগুরা' সংস্কৃত শব্দ, উহার অর্থ জাল, পাশ। (বা ধাতু+উর, গ- কারাগম, স্ত্রীলিঙ্গে আ)।

পংক্তি—২২। 'বলিদান':—অর্থাৎ সুখের জন্য ধর্ম্ম ও নীতি বিসর্জ্জন করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছ। সুখবাসনাকে 'সুপরিমার্জ্জিত বেদি' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ সুপরিষ্কৃত বেদিতে আরাধ্য দেবতা স্থাপন করিয়া তাহার অর্চ্চনা ও সন্তোষবিধান করিতে হয়, সুখান্বেষী ব্যক্তিও সেইরূপ সুখবাসনাকে সযত্নে পরিপোষণ করেন ও তাহা চরিতার্থ করিতে যত্নপর হন।

পৃষ্ঠ—৬৩।

পংক্তি—৩—৪। 'দুঃখি', 'শোকি' ঃ—সংস্কৃত দুঃখিন্ ও শোকিন্ শব্দ প্রথমার একবচনে যথাক্রমে 'দুঃখী' ও 'শোকী' এইরূপ ধারণ করে। সম্বোধনে 'দুঃখিন্' ও 'শোকিন্" হওয়া উচিত। কিন্তু এইরূপ শব্দশুদ্ধি কালীপ্রসন্ন ঘোষের ন্যায় সংস্কৃতপ্রিয় লেখকও উৎকট বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

পংক্তি—৯। 'মৃগতৃষ্ণিকা' ঃ—মরুভূমির উপরিস্থ উষ্ণবায়ু, ইহা সূর্য্যকিরণে দূর হইতে জলাকার দেখায়। জলভ্রমে ইহার প্রতি ধাবমান হইয়া মৃগ বা পশুগণ বিপন্ন হয় বলিয়া সংস্কৃতে ইহার নাম মৃগতৃষ্ণা বা মৃগতৃষ্ণিকা। এই শব্দ আশার উৎপাদক অলীক অথচ মনোহর দৃশ্য-মাত্রের প্রতিই প্রযুক্ত হয়।

পংক্তি—২১। 'জীবনগ্রন্থির সহিত গ্রথিত রহিয়াছে'ঃ—অর্থাৎ জীবনের অবলম্বনস্বরূপ। ভবিষ্যতে সুখের আশা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক না হইলে শোক-দুঃখে প্রাণধারণ করা অসম্ভব হইত।

পৃষ্ঠা – ৬৪।

পংক্তি—১৬। 'অপরাধ নহে' ঃ—পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ইতিহাসের উদ্দেশ্য নহে। ইতিহাস অতীত ঘটনার আলোচনা করে। সেই জন্য পরকালসম্বন্ধে নীরব বলিয়া ইতিহাসকে দোষ দেওয়া চলে না।

পৃষ্ঠা – ৬৫।

পংক্তি—৯। 'হোমার' ঃ—সুবিখ্যাত প্রাচীনতম গ্রীক কবি। ইঁহার জন্মস্থান ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নানা মত আছে। কাহারও মতে ইনি খৃষ্টের জন্মের ৯৬৮ বৎসর, কাহারও মতে ৯০৭ বৎসর ও কাহারও মতে ৮৮৪ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৭টি বিভিন্ন নগরীর অধিবাসিগণ তাহাদের নিজ নিজ

নগরীতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করেন। কায়স্ (Chios) দ্বীপে তিনি বৃদ্ধ বয়সে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার ইলিয়াদ (Iliad) ও ওডিসি (Odyssey) নামক মহাকাব্যদ্বয় ওজঃ ও মাধুর্য্য গুণে ইউরোপীয় সাহিত্যে অতুলনীয় বলিয়া অদ্যাপি বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট সম্মান ও আদর লাভ করিতেছে। অনেকে বলেন তিনি অন্ধ ছিলেন।

'মিল্টন' ঃ—সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। জন্ম--১৬০৮ খৃঃ, মৃত্যু—১৬৭৪ খৃঃ। ইংলণ্ডীয় কবিকুলে সেক্সপীয়রের পর তাঁহাকেই উচ্চতম আসন দেওয়া হয়। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কাব্য প্যারাডাইস্ লষ্ট (Paradise Lost) ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কয়েকখানা কাব্য ও কয়েকখানা গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হইয়াছিলেন। অন্ধাবস্থায়ই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি রচিত হয়। পারিবারিক জীবনে তিনি অত্যন্ত অসুখী ছিলেন। তাঁহার অপর প্রধান গ্রন্থ স্যামসনে (Samson Agonistes.) এই পারিবারিক অশান্তির ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে।

'ভল্টেয়ার' ঃ—[ইঁহার প্রকৃত নাম Francois Marie Arouet ইনি নিজে Voltaire নাম গ্রহণ করিয়া ঐ কল্পিত নামে গ্রন্থাদি লিখিতেন] ফরাসী কবি, ঐতিহাসিক ও জীবন-চরিত লেখক। তাঁহার গ্রন্থাবলি ৭০ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। জন্ম—১৬৯৪ ও মৃত্যু—১৭৭৮ খৃঃ অঃ। তাঁহার প্রধান প্রধান গ্রন্থ ;—ইডিপাস (Œdipus), ব্রূটাস (Brutus), এসে অন্ জেনারেল হিষ্টরি (Essay on General History) ইত্যাদি।

'ভবভূতি' ঃ—সুবিখ্যাত সংস্কৃত 'উত্তর-চরিত' 'মালতী-মাধব' ও 'বীর-চরিত' নামক নাটকত্রয়ের রচয়িতা। কালিদাসের পরে ইঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সম্মান করা হয়। ইনি কনোজরাজ যশোবর্ম্মার

সভা-পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে যে, কাশ্মীর প্রদেশের রাজা ললিতাদিত্য কনোজ বিজয় করিলে উভয় নৃপতির মধ্যে এই মর্ম্মে সন্ধি হয় যে, ভবভূতি কাশ্মীর দেশে গমন করিবেন। ললিতাদিত্য ৬৯৩—৭২৯ খৃঃ জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

পংক্তি—১০। 'অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে' ঃ—মানবের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্রোন্নতির সাহায্য করিয়া তাহাদের উপকার করিতেছেন।

পৃষ্ঠা—৬৬।

পংক্তি—১৬। 'মরিয়া গিয়াছেন' ইত্যাদি ঃ—মরিয়াও যান নাই, বৃদ্ধও হন নাই।

পংক্তি—১৭। 'ভ্রমরভয়ব্যাকুলা' ঃ—এই চিত্র কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের প্রথমাঙ্কে অঙ্কিত আছে।

পংক্তি—২১। 'যোগিকুলধ্যেয়' ইত্যাদি ঃ—মহাদেবের ধ্যান ও মদন কর্ত্তৃক তাঁহার ধ্যানভঙ্গ-বৃত্তান্ত 'কুমারসম্ভব' ৩য় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। 'নিবাত নিষ্কম্প' ঃ—ইহা কালিদাসের ভাষা। "নিবাত-নিষ্কম্পামিব প্রদীপম্" ("কুমারসম্ভব", তৃতীয় সর্গ—৪৮ শ্লোক)।

পৃষ্ঠা—৬৭।

পংক্তি—১—৪। এই চিত্র কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গ, ৪২—৬৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পংক্তি—৯। 'চাক্ষুষ প্রতীতির লৌকিক জীবনে' ঃ—এই স্থানের ভাব ভাষার আড়ম্বরে চাপা পড়িয়াছে। অর্থ এই,—যতদিন রামচন্দ্র প্রত্যক্ষ-দর্শনের বিষয় ছিলেন, ততদিন তিনি অযোধ্যাবাসী ছিলেন, এক্ষণে কীর্ত্তিবলে লোকের স্মৃতিপটে বিরাজমান রহিয়া কেবল অযোধ্যায় নহে, জগতের সর্ব্বত্র প্রীতি ও ভক্তির অর্ঘ্য লাভ করিতেছেন; সুতরাং এখন তাঁহাকে অযোধ্যাবাসী না বলিয়া জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান বলা যাইতে পারে।

পংক্তি—১৯। 'সারস্বত স্বর্গ' :—সরস্বতীর বরপুত্রগণের সম্মিলন-স্থান। সে স্থান পবিত্র কথার আলোচনা হেতু পবিত্র বলিয়া স্বর্গ নামে অভিহিত হইয়াছে। সরস্বতী+অণ্=সারস্বত।

পৃষ্ঠা—৬৮।

পংক্তি—২। 'লোকস্মৃতির অমরাবতী' :—'অমরাবতী'=ইন্দ্রের রাজধানী; ইহা দেবতা ও পরলোক-গত পুণ্যবান্ লোকের বাসস্থান। পুণ্যকীর্ত্তি ব্যক্তিগণ চিরদিন লোকের স্মৃতিতে অমর ভাবে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

পংক্তি—৮। 'অচিরগত' :—অল্পদিন যাবৎ মৃত।

'রিচার্ড কবডেন':—ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাজনৈতিক। ইনি খাদ্যশস্য-বিষয়ক আইনের পরিবর্ত্তন জন্য আন্দোলন করিয়া ও তাহাতে সাফল্য লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ঐ আইন ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রহিত হয়। জন্ম—১৮০৪, মৃত্যু—১৮৬৫ খৃঃ অঃ।

পংক্তি—১৭। 'পদ্মাসন' :—যোগের সময় নানারূপ আসন অর্থাৎ করচরণাদি-সংস্থানের নিয়ম আছে। এই আসন তন্ত্রসার মতে পাঁচ প্রকার,—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন। (পদ্মাসনের নিয়ম এই,—ঊর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে। অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াৎ হস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাৎ তথা।)

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জন্ম—১২৫৩ সাল (১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ); মৃত্যু—১২৯৩ সাল (১৮৮৬ খৃঃ), জন্মস্থান—নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী গোস্বামি-দুর্গাপুর। ইনি প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজে ও তৎপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে

শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতা জেনারাল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কটক কলেজ ও বহরমপুর কলেজে কিছু দিন অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া রাজকৃষ্ণ পরিশেষে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের বঙ্গানুবাদকের পদ লাভ করেন। তিনি 'কবিতামালা,' 'মিত্রবিলাপ,' 'কাব্য-কলাপ,' 'মেঘদূত' প্রভৃতি নামে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। "বাঙ্গালার ইতিহাসের" কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা—৬৯।

পংক্তি—১৩। 'ব্যবস্থা' ঃ—রাজবিধি ও সামাজিক প্রথামূলক অন্যান্য বিধি—আইন।

পংক্তি—২০। 'গণিতের অধীন হয়' ঃ—অর্থাৎ গণিতের নিয়মাবলী দ্বারা গণনা ও পরীক্ষার যোগ্য হয়। পদার্থ-বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতিতে উল্লিখিত তত্ত্ব গণিতের নিয়মাবলীর বিশেষ ভাবে "অধীন" বলিয়া তাহা সমধিক উন্নত।

পৃষ্ঠা—৭০।

পংক্তি—২। 'জ্যোতিষের' ইত্যাদি। আকাশস্থ জ্যোতির্ম্মণ্ডল-গুলির এক একটি বিভাগে (Systems) যত গুলি গ্রহ প্রভৃতি থাকে তাহারা পরস্পর মাধ্যাকর্ষণে বদ্ধ, নিউটন এই মত প্রথম অবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। ভাস্করাচার্য্যাদিও এই বিষয় অবগত ছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদি-প্রণীত 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে মাধ্যাকর্ষণ-শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

পংক্তি—১০। 'নয়টি অঙ্ক' ঃ—অর্থাৎ ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত অঙ্কগুলি। দশ হইতে তদূর্দ্ধ সমস্ত সংখ্যা ঐ নয়টি অঙ্ক ও শূন্য সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

পংক্তি—১২। 'এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌' ঃ—মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌।

ইনি ১৮শ বর্ষ বয়সে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। নানা পদে অসাধারণ যোগ্যতা প্রদর্শন করিবার পর তিনি ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গবর্ণর নিযুক্ত হন ও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ ভারতের ইতিহাস তাঁহার অবসর গ্রহণ করার পর রচিত হয়। মৃত্যু—১৮৫৯ খৃঃ।

পাটীগণিতের দশগুণোত্তর সংখ্যালিখনপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার মত তাঁহার ইতিহাসের (নবম সংস্করণ) ১৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পংক্তি—১৩। 'দশগুণোত্তর' ইত্যাদি ঃ—দশক, শতক সহস্র প্রভৃতি ক্রমানুসারে বাম দিকে সংখ্যাস্থাপন-প্রণালী। আমরা যে প্রণালীতে সংখ্যা লিখিয়া থাকি ইহাই দশগুণোত্তর সংখ্যালিখন-প্রণালী (Decimal notation).

পৃষ্ঠা—৭১।

পংক্তি—৪। 'আল জিবর' ঃ—অর্থাৎ সমীকরণ।

পংক্তি—৫। 'লিওনার্ডো' ঃ—লেওনার্ডো অব্ পিসা (Leonardo of Pisa) ইনি বাল্যকালে বারবেরি রাজ্যে বাস করিতেন, তথায় ভারতীয় প্রথানুসারে নয় সংখ্যা ও শূন্য দ্বারা গণনাপ্রণালী শিক্ষা করেন। ইঁহার গণিতবিষয়ক গ্রন্থ ১২০২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়; ১২২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই গ্রন্থ সংশোধন করিয়া পুনঃ প্রকাশ করেন।

পংক্তি—১১। 'কোলব্রুক' ঃ—ইনি ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আগমন করেন, ও রাজস্ববিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ত্রিহুত ও পূর্ণিয়ায় বাস করেন। পরে ইনি কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, ও ক্রমে জজিয়তি, রাজস্ব বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের পদ ও সুপ্রিম কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বরের পদ লাভ করেন। হিন্দু দর্শন, গণিত, প্রাচীন কীর্ত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে ইঁহার

বহু গ্রন্থ আছে। ইনি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে 'ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য হইতে সঙ্কলিত বীজগণিত, পাটীগণিত, ও পরিমিতি' (Algebra, Arithmetic and Mensuration from the Sanscrit of Brahmagupte and Bhascare) নাম দিয়া একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন; ইহাতে ভাস্করাচার্য্যের 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' হইতে বীজগণিত ও লীলাবতী এবং ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' হইতে গণিতাধ্যায় ও কুট্টকাধ্যায় অনূদিত হইয়াছে।

পংক্তি—১৭। 'হিন্দুদিগের নিকট' ইত্যাদি :—এল্ ফিন্ষ্টোন্ সাহেব বলেন, বিজ্ঞানাদিতে আরবদিগের গ্রন্থের সঙ্গে হিন্দুদিগের গ্রন্থের যে যে অংশে সাদৃশ্য আছে, সেই সেই অংশ হিন্দুগণ হইতেই আরবগণ গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। তাঁহার ভারতের ইতিহাস ১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পংক্তি—২২। আরবীয়গণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের দেশের মহম্মদ বিন মুসা সর্ব্বপ্রথম বীজগণিতের আবিষ্কার করেন। ইনি খুজিয়ানাবাসী মহম্মদ বলিয়াও পরিচিত। পাশ্চাত্য জগতে ইনি Moses নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইনি খলিফা আলমামনুরের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় নবম (?) শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।—"বিশ্বকোষ"।

পৃষ্ঠা।—৭২

পংক্তি—১—২। এই স্থানে প্রদত্ত তারিখগুলি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। রাজকৃষ্ণ ডাঃ ভাউদাজির মত গ্রহণ করিয়াছেন। * আর্য্যভট্টের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোলব্রুক সাহেবও অনুমান করিয়াছেন যে, ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের লোক।

'আর্য্যভট্ট' :—সুবিখ্যাত হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ। ইনি সূর্য্যের

* Journal of the Royal Asiatic Society, new series, vol. 1...Quoted by E. B. Cowell.

চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর আবর্ত্তন ও পৃথিবীর আহ্নিক গতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হয়।

'বরাহমিহির' ঃ—ইনি আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তী কালের জ্যোতির্ব্বিদ। বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে ইনি এক রত্ন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বরাহ ও মিহির দুই বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, উঁহারা উভয়ে মিলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই মতের সমর্থক সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। বরাহমিহিরের গ্রন্থের নাম 'বৃহৎসংহিতা।' ইঁহার প্রণীত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত রোমক সিদ্ধান্তের একটি শ্লোক অনুসারে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইনি ৪২৭ শকের চৈত্রমাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

'ব্রহ্মগুপ্ত' ঃ—ইনিও প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ৫৫০ খৃষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' রচনা করেন।

পংক্তি—৭। 'দিও ফান্তস্' ঃ—ইনি আলেকজান্দ্রিয়াবাসী ছিলেন। কথিত আছে ইনি ইউরোপে বীজগণিত-চর্চ্চার প্রবর্ত্তক। গণিত সম্বন্ধে ইনি যে গ্রন্থ লিখেন উহা ১৩ খণ্ডে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে প্রথম ছয় খণ্ড সম্পূর্ণ ও শেষ ৭ খণ্ড অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। দিও ফান্তস্ ৮৪ বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহার জীবিতকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট্ জুলিয়ানের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। কাহারও মতে তিনি খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

'দুই শতাব্দী' ইত্যাদি ঃ—মহম্মদ আবুল ওয়াফা মহম্মদ বিন মুসা কৃত বীজগণিতের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তিনি দিও ফান্তসের গ্রন্থেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার আবির্ভাবকাল খৃঃ দশম শতাব্দী বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

পংক্তি—১২। 'গ্রেগরি আবুল ফরাজ' ঃ—ইনি আরবী ভাষায়

জগতের ইতিহাস রচনা করেন। জন্ম ১২২৬ ও মৃত্যু ১২৮৬ খৃষ্টাব্দ।

পংক্তি—১৩। 'জুলিয়ান্' ঃ—ফ্লেভিয়াস্ ক্লডিয়াস্ জুলিয়েনাস্। ৩৩১—৩৬৩ খৃষ্টাব্দ।

পংক্তি—১৫। '৩৬০ খৃষ্টাব্দ' ঃ—এই মত এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবও গ্রহণ করিয়াছেন।

পংক্তি—১৮। 'পরাশর, গর্গ, বশিষ্ঠ' ঃ—ইঁহারা প্রাচীন আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ। ইঁহাদের মধ্যে পরাশরের গ্রন্থ পাওয়া যায়। ডেভিস্ সাহেব (Asiatic Researches Vol. V.) বলিয়াছেন যে, পরাশর সংহিতায় লিখিত জ্যোতির্ব্বিবরণ খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৩৯১ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

পংক্তি—২০। 'আর্য্যভট্ট যে' ইত্যাদি ঃ—এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব Edinburgh Review Vol. XXIX অবলম্বন করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস ১৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা—৭৩।

পংক্তি—১৭। আল্‌কেমী—আরবী শব্দ। ইহার অর্থ—গুপ্ত বিদ্যা।

পংক্তি—২২। 'চরক ও সুশ্রুত' ঃ—অদ্যাপি কেহ ইঁহাদের অবির্ভাবকাল নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। চরক-প্রণীত গ্রন্থের নাম 'চরক সংহিতা'। সুশ্রুত-প্রণীত গ্রন্থের নাম 'সুশ্রুত'। সুশ্রুত বিশ্বামিত্র মুনির অপত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পৃষ্ঠা—৭৪।

পংক্তি—৪। 'হারুণ আল রসিদ' ঃ—আরবী ও পারসী সাহিত্য ইঁহার ন্যায়পরায়ণতা, বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখে পূর্ণ।

ইঁহার জন্ম ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ও মৃত্যু ৮০৯ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

'দুই জন হিন্দু চিকিৎসক' ঃ—ইহাদের নাম মঙ্ক ও সালে।

পংক্তি—৭। এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবের ইতিহাসের ১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পংক্তি—৮। 'গান্ধকিক অম্ল' = সালফিউরিক এ্যাসিড (Sulphuric acid)। 'যাবক্ষারিক অম্ল' = নাইট্রিক এ্যাসিড্ (Nitric acid); 'লাবণিক অম্ল' = মিউরিয়্যাটিক এ্যাসিড (Muriatic acid)।

পংক্তি—৯। যৌগিক পদার্থ—অক্সাইড, সালফেট, কার্ব্বনেট প্রভৃতি।

পংক্তি—১২। ডাক্তার ওশানসী' ঃ—ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। ভারতবর্ষে তাড়িতযোগে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থার সম্পর্কে ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

পংক্তি—১৪। 'দ্রাবক ঃ—"অম্ল" বা এ্যাসিড্।

পৃষ্ঠা—৭৫।

'বর্ণমালা' ঃ—চীনদেশীয় বর্ণমালা চীনে, ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতরূপে, জাপানে প্রচলিত। ফিনিসীয় বর্ণমালা হইতে বর্ত্তমান ইউরোপের সমুদায় বর্ণমালা উদ্ভূত হইয়াছে।

পংক্তি—৮। ভারতবর্ষীয় বর্ণমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্নমত প্রচলিত আছে। প্রিন্সেপ প্রভৃতি পণ্ডিতের মতে ইহা গ্রীকদিগের অক্ষর হইতে, বিউলার প্রভৃতির মতে ফিনিসীয় অক্ষর হইতে এবং ডাউসন প্রভৃতির মতে উহা ভারতবর্ষেই উৎপন্ন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আইজাক টেলারের আলফাবেট নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথমাধ্যায়েও এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে।]

'বর্ণমালা...বৈজ্ঞানিক' ইত্যাদি ঃ—এস্থলে রাজকৃষ্ণ, বর্ণমালার আকারের বিষয় বিবেচনা না করিয়া উচ্চারণস্থানাদি ভেদে বিভাগের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। আকার সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয় প্রাচীন বর্ণমালার প্রশংসা করিয়াছেন। *

পংক্তি—১১। 'ছয়শত বৎসর' ঃ—এলফিনষ্টোন্ সাহেব, বুদ্ধের মৃত্যু খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫০ অব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, মোক্ষমূলরের মতে খৃঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করেন। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মোক্ষমূলরের নির্দ্ধারিত তারিখের পক্ষপাতী। বুদ্ধ ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং মোক্ষমূলরের মতে তাঁহার জন্মাব্দ খৃঃ পূঃ ৫৫৭ ; আর এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের মতে খৃঃ পূঃ ৬৩০।

পংক্তি—১৩। 'রাজার পুত্র' ঃ—পণ্ডিতপ্রবর রাইস ডেভিড্‌সের মতে বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোধন প্রকৃত পক্ষে রাজা ছিলেন না, তিনি উচ্চবংশোদ্ভব সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন মাত্র। †

পৃষ্ঠা—৭৬।

পংক্তি—৯। 'তিন শত' ইত্যাদি—এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, অশোক খৃঃ পূঃ ২৬০ অব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ও খৃঃ পূঃ ২২২ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার জীবনী ও পাষাণে

---

* টেলার সাহেব অশোকের ব্রাহ্মী লিপির সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

The elaborate and beautiful alphabet employed in these records is unrivalled among the alphabets of the world for its scientific excellence.

Vide Issac Tayler's *Alphabet* vol. II p. 289 *et esq.*

† *Vide Early Buddhism* by T. W. Rhys Davids. "Religions : Ancient and Modern" Series. p. 27.

উৎকীর্ণ আদেশ-লিপি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা *rulers of India* Series এর Asoka নামক গ্রন্থে আছে।

পৃষ্ঠা—৭৭।

পংক্তি—৬। 'ঋগ্বেদে' ইত্যাদি :—ঋগ্বেদ প্রথম ১ম মণ্ডল ১০৫ সূক্ত ৮ম ঋক দ্রষ্টব্য। এই ঋকের শেষাংশের বঙ্গানুবাদ যথা :—

"মূষিক যেরূপ সূত্র দংশন করে, হে শতক্রতো! আমি তোমার স্তোতা, দুঃখ আমাকে সেইরূপ দংশন করিতেছে; হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই বিষয় অবগত হও।"

এই স্থলের ভাষ্যে সায়ন বলেন :—

"তন্তুবায়ের সূত্রগুলিতে ভাতের মাড় দেওয়া থাকে বলিয়া ইন্দুরেরা তাহা ভক্ষণ করিতে ভালবাসে।"

(রমেশচন্দ্র দত্তকৃত বঙ্গানুবাদ)

পংক্তি—১০। 'চীনই হউক' :—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন যে, অতি প্রাচীনকালে চীনদেশ হইতেই রেশমবস্ত্র ভারতবর্ষ আরবদেশ, ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে রপ্তানি হইত। রেশমবস্ত্রের সংস্কৃত এক নাম চীনাংশুক। যথা, শকুন্তলা :—চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।" মহাভারত সভাপর্ব্বেও চীনাংশুকের উল্লেখ আছে।

চন্দ্রনাথ বসু।

জন্ম—১২৫১ সাল (১৮৪৪ খৃঃ); মৃত্যু—১৩১৭ সাল (১৯১০ খৃঃ); জন্মস্থান—হুগলী জেলার অন্তর্গত কৈকালা গ্রাম। চন্দ্রনাথের পিতা ও পিতামহ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, চন্দ্রনাথ তাঁহাদের নিকট হইতে

স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শৈশবে তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠারম্ভ করেন, পরে কলিকাতায় প্রথমে হেদোয় পাদরীদের স্কুলে ও পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে অধ্যয়ন করেন। তথা হইতে তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। চন্দ্রনাথ অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৬৭ সালে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া তিনি প্রথমে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন, কিন্তু কিছুদিন মধ্যে তাহা ত্যাগ করিয়া ডেপুটী কালেক্টরী পদ গ্রহণ করেন। ছয়মাস মধ্যে তাহাও ত্যাগ করিয়া জয়পুর কলেজে প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করেন, অল্পদিন মধ্যে তাহাও ত্যাগ করিয়া প্রথমে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরীয়ান ও পরে বঙ্গানুবাদকের পদ লাভ করেন।

চন্দ্রনাথ প্রথমে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখিতেন ও পুস্তকাদি সমালোচনা করিতেন। তিনি 'কলিকাতা রিভিউ' নামক ইংরেজী পত্রে বঙ্কিম-চন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা করেন, তাহা পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে বাঙ্গালা লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তাহারই ফলে তাঁহার 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' প্রণীত হয়। চন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "শকু-ন্তলা-তত্ত্ব লিখিবার পর সরকারী কার্য্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরেজী লিখি নাই—লিখিতে আর ইচ্ছা হয় নাই।" তাঁহার গ্রন্থাবলীর নাম ঃ— 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' 'ত্রিধারা' 'হিন্দুত্ব' 'সাবিত্রী-তত্ত্ব,' 'কঃ পন্থা' প্রভৃতি।

পৃষ্ঠা—৭৮।

পংক্তি—১৭। 'যম নিষ্ঠুর' ইত্যাদি ঃ—এই ভাব কবিতায়ও নানা স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে, যথা—

ওরে দুরাচার যম! নির্ম্মম নির্দ্দয়,
কেবল সংহার কার্য্য তোর ব্যবসায়,

দিন নাই ক্ষণ নাই যারে ইচ্ছা হয়,
অমনি উদরসাৎ করিস তাহায়।
—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা—৭৯।

পংক্তি—১৩। ‘দাগাদারি’ ঃ—হৃদয়বিদারক ব্যবহার।

পংক্তি—১৮। ‘মূর্ত্তিও তেমনি ভীষণ’ ঃ—গ্রীক দেশীয় কবিগণও যমের আকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী ছিলেন। *

—৮০।

পংক্তি—১৩। ‘সাবিত্রী’ ঃ—মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা ও শাল্বরাজ দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানের পত্নী। ইনি পিতার আদেশে স্বয়ং স্বামিসন্ধানার্থ নানা স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক অরণ্যবাসী সত্যবান্‌কে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া পিতার নিকট স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, পিতৃসভাস্থ নারদের মুখে শুনিলেন যে, সত্যবান্ নিতান্ত অল্পায়ুঃ। তথাপি তিনি মনে মনে বৃত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অপর পতি গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী হইলেন না। বিবাহান্তে সত্যবান্ এক দিন পত্নীসহ কাষ্ঠাহরণার্থ বনে গমন করিলেন। সেইখানে সত্যবানের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। তৎপরে যম সত্যবান্‌কে নিতে আসিলে সাবিত্রী নানা বাক্যে যমের সন্তোষবিধান করিয়া সত্যবানের পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করেন। যম তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। মূল উপাখ্যান মহাভারত বনপর্ব্ব ২৯২—২৯৮ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

---

* যথা :—"He (Pluto) is looked upon as a hard-hearted and inexorable god with a grim and dismal countenance, and for that reason no temples were raised to his honour, as to the rest of the superior gods"...... *Lempriere*.

এই প্রবন্ধে ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত অংশগুলি সংস্কৃতের অনুবাদ। এই অনুবাদ বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত মহাভারতানুবাদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

পংক্তি—১৭। শ্যামগৌরবর্ণ :—মূল মহাভারতে আছে 'শ্যামাবদাত'। অবদাত=শুভ্র। যমের বর্ণ শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ হইলেও তাঁহার দেহ শুভ্রজ্যোতির্ম্মণ্ডিত ছিল এইরূপ মনে করিতে হইবে। তাঁহাকে পূর্ব্বে "সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী" বলা হইয়াছে।

পৃষ্ঠা —৮১।

পংক্তি—৩। 'অসংখ্য নরক' :—দেবীপুরাণে নরকসংখ্যা ৫০ কোটি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পংক্তি—১৪। 'কঠোপনিষদ্' :—যজুর্ব্বেদের কঠনামক শাখার অন্তর্গত উপনিষদ্‌বিশেষ। 'উপনিষদ্' :—শ্রুতি বা বেদকে সচরাচর তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা (১) মন্ত্র (২) ব্রাহ্মণ ও (৩) উপনিষদ্। ঋগ্বেদসংহিতা বা অপরাপর বেদের সংহিতা ভাগে যে সকল মন্ত্র লিখিত আছে তাহাই বেদের মন্ত্রাংশ। 'ব্রাহ্মণ'-গুলিতে যজ্ঞের প্রক্রিয়া ও প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিনিয়োগ বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদ্‌গুলির উদ্দেশ্য ব্রহ্মস্বরূপ-বর্ণন।

'নচিকেতা' :—৬০ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তির বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

পংক্তি—১৭ :—'ধর্ম্মোন্মাদ' :—উৎকট ধর্ম্মানুরাগ।

পৃষ্ঠা—৮৪।

পংক্তি—৬। 'নিয়তি' :—অদৃষ্ট। হিন্দু শাস্ত্র মতে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ও পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ পরজন্মে লোকের শুভাশুভের কারণ হয়।

রজনীকান্ত গুপ্ত।

জন্ম—১২৫৬ সাল (১৮৪৯ খৃঃ) মৃত্যু ১৩০৭ সাল (১৯০০ খৃঃ); জন্মস্থান—ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রাম। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে রজনীকান্তের পাঠারম্ভ হয়। তিনি অল্প বয়সে কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন; তদবধি তাঁহার শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া তিনি সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ করেন। তাঁহার অভিভাবকগণের অভিপ্রায় ছিল, তিনি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন, কিন্তু সে অভিপ্রায় সফল হয় নাই। তিনি সাহিত্য চর্চ্চায়ই জীবন আতিবাহিত করেন, এবং তদ্দারাই প্রচুর ধন ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'জয়দেব চরিত' ছাত্রাবস্থায় রচিত হয়। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ এইঃ—'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস', 'আর্য্যকীর্ত্তি', 'বীরমহিমা', 'প্রতিভা', 'ভীষ্মচরিত' 'ঐতিহাসিক পাঠ' প্রভৃতি।

পৃষ্ঠা—৮৮।

পংক্তি—১। 'হিউএনথ্ সঙ্গ'ঃ—"হিউএনথ্ সঙ্গ" একটি বৌদ্ধমঠে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটেও তিনি অনেক বিষয় শিখিয়াছিলেন। যাহা হউক বিদ্যালয়ের শিক্ষার পর হিউএনথ্ সঙ্গ বৌদ্ধ যতির শ্রেণীতে নিবেশিত হয়েন। এই সময়ে তাঁহার বয়স তের বৎসর।" পরে ৭ বৎসর কাল তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রধান প্রধান অধ্যাপকের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞানে স্বদেশে অসাধারণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে মূল গ্রন্থাদি পাঠ করিবার জন্য ভারতে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বীল সাহেব কর্ত্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা—৮৯।

পংক্তি—২৩। 'ধর্ম্মবীর' ঃ—যিনি ধর্ম্মচর্য্যা ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য কঠোর ক্লেশ স্বীকার করেন।

পৃষ্ঠা—৯১।

পংক্তি—২১। 'কপিলবাস্তু' ঃ—বুদ্ধের পিতার রাজধানী। ইহা বারাণসীর ৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন নগর; অনেক পুস্তকে ইহাই বুদ্ধদেবের জন্মস্থান বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনি নামক গ্রাম। এই স্থানে অশোকের একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

'শ্রাবস্তী' ঃ—ইহাও অতি প্রাচীন নগর। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা অতি প্রসিদ্ধ নগরী। এই স্থানে অনাথ পিণ্ডিক নামক এক বণিক্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত 'জেতবন' বিহারে অবস্থিতি করিয়া, বুদ্ধদেব ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। ইঁহার বর্ত্তমান নাম শেট্ মহেট্; ইহা অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন, শ্রাবস্তীর প্রাচীনতর নাম শরাবতী।

বারাণসী ঃ—কাশী। ইহা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি-গণের তীর্থস্থান। গৌতম বুদ্ধ সর্ব্ব প্রথম বর্ত্তমান বারাণসীর নিকটস্থ মৃগদাব (সারনাথ) নামক স্থলে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন।

'বুদ্ধগয়া' ঃ—এই স্থানে বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধ বহুদিন তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন। ইহা হিন্দু তীর্থ গয়ার নিকটবর্ত্তী। ইহার অপর প্রচীন নাম বোধগয়া।

পৃষ্ঠা—৯২।

পংক্তি—১৩। 'পঞ্চনদ' ঃ— পঞ্জাব।

পংক্তি—২২। গরীয়সী ঃ—(গুরু+ঈয়সুন্) ঈয়সুন্ প্রত্যয় ও

তরপ্ প্রত্যয়, দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। এ স্থলে ইহা 'দ্বিগুণতর' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় কোনও রূপ তুলনা না বুঝাইয়া 'অত্যন্ত পূজনীয়' এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিংবা হয়ত রজনীকান্ত 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' এই বাক্য স্মরণ করিয়া বিদেশ ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশ চীন অধিকতর পূজনীয় এই অর্থে 'গরীয়সী' পদ প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন।

পৃষ্ঠা—৯৩।

পংক্তি—২৩। 'নিয়মাবলী' :—ধর্ম্মব্যবস্থা। বুদ্ধপ্রদত্ত কতকগুলি ব্যবস্থা তাঁহার মৃত্যুর পর 'বিনয়পিটক' নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়।

পৃষ্ঠা—৯৫।

পংক্তি—৬। 'শ্রমণ' :—যতি, বিশেষতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু।

পংক্তি—১৬। 'অশোক' :—৭৬ পৃষ্ঠা ১০ পংক্তি বিবৃতি দেখ।

কনিষ্ক :—বিখ্যাত শকনৃপতি। ইনি শকাব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। ইনি কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন এবং তথা হইতে গুজরাট ও আগ্রা পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তৃত করেন। ইঁহার সময়ে বৌদ্ধদিগের এক মহাসম্মিলন হয়।

পৃষ্ঠা ৯৬।

পংক্তি—১। 'হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য' :—ইনি দ্বিতীয় শীলাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ; ইঁহার রাজত্বকাল ৬১০—৬৫০ খৃষ্টাব্দ। ইঁহার প্রবর্ত্তিত সন্তোষক্ষেত্রের মহোৎসব তদানীন্তন ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা।

পংক্তি—৪। 'দ্বিতীয় পুলকেশী' :—চালুক্যবংশীয় রাজা, ইনি ৬১১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। নানা দেশ জয় করিয়া ইনি 'পরমেশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন। ইঁহার অন্য উপাধি 'সত্যাশ্রয় শ্রী পৃথ্বীবল্লভ মহারাজ'।

[Vide Dr. Bhandarkar's *Early History of the Dekkan* pp. 38—41]

পংক্তি—১৪। 'বৈশালী' ঃ—বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ নগরী। জেনারেল কানিংহাম মনে করেন, এই নগরী বর্ত্তমান পাটনা সহরের ২৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। সংসারত্যাগের পর বুদ্ধ এই স্থানে কিছু দিন আলাড় কালাম নামক পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। বুদ্ধত্বলাভের পর তিনি এই স্থানে চাপাল চৈত্যে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা ৯৮।

পংক্তি—১০। 'ভারতীয় লীলাভূমি' ঃ—এই পদদ্বয়ের অর্থ সুস্পষ্ট নয়। 'লীলা', শব্দ ক্রীড়া, বিলাস প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত হয়। নালন্দা কাহার বা কাহাদের লীলা ভূমি তাহা লিখিত হইলে অর্থ সুগম হইত। ভারতের প্রাচীন গৌরব ও সরস্বতীর বা জ্ঞানবৃদ্ধ স্থবিরগণের লীলা ভূমি—এইরূপ কোনও অর্থে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে।

পৃষ্ঠা ৯৯।

পংক্তি—৪। বর্ষীয়ান্ ঃ—বৃদ্ধ+ঈয়সুন্। এই শব্দও বৃদ্ধতর অর্থে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। সময় সময় অতি বৃদ্ধ অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ৯২ পৃষ্ঠা—২২ পংক্তির বিবৃতি দেখ।

পৃষ্ঠা—১০০।

পংক্তি—২১। 'উত্তপ্ত জল' ঃ—মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থেও এইরূপ বিচারপদ্ধতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। *

---

* নৈষধ কাব্যে এইরূপ এক পরীক্ষার উল্লেখ আছে, যথা ঃ—

সুষমাবিষয়ে পরীক্ষণে নিখিলং পদ্মমভাজি তন্মুখাৎ।
অধুনাপি ন ভঙ্গলক্ষণং সলিলোন্মজ্জন মুজ্ ঝতি স্ফুটম্।

২য় সর্গ ২৭ শ্লোক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জন্ম——১২৬৮ সাল (১৮৬১ খৃষ্টাব্দ), জন্মস্থান, কলিকাতা। ইঁহার পিতামহের নাম প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইঁহার শিক্ষা একরূপ স্বগৃহে পিতার তত্ত্বাবধানেই সম্পূর্ণ হয়। মধ্যে কিছুদিন ইনি নর্ম্মাল স্কুলে পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইউরোপে গমন করিয়া ইংলণ্ডে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে কবিবর ৺ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কাব্যগুলি তিনি তাঁহার নিজ রচনার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ কাব্যরচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বর্ত্তমান সমালোচক এককালে 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদা মঙ্গলে'র কবির নিকট হইতে কাব্যশিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে বলা যায় না।" 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদা মঙ্গল' বিহারীলালের রচিত।

মনুসংহিতা ৮ম অধ্যায় ১১৪ শ্লোক, ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ব্যবহারাধ্যায় দিব্যপ্রকরণ দ্রষ্টব্য।

দোষীর দোষনির্ণয় জন্য এইরূপ বিচারপ্রথা অন্যান্য দেশেও প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। নর্ম্মাণগণ কর্ত্তৃক বিজয়ের পূর্ব্বে এবং ঐ বিজয়ের পরেও ৩য় হেনরীর রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত এই প্রথা ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল।

[Ordeals were of several kinds, but the most usual were by *wager of battle*, by *hot* or *cold water*, and by *fire*. This method of trial was introduced from the notion that God would defend the right, even by miracle if needful.—*Brewer*.]

রবীন্দ্রনাথের কাব্য (যথা, 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী', 'কথা' 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি) উপন্যাস (যথা, 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি), ক্ষুদ্র গল্পমালা (যথা, গল্পগুচ্ছ), নাটক (যথা, 'রাজা ও রাণী' 'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রভৃতি) ও গান সাধারণের নিকট সুপরিচিত ; এবং সকলগুলিই তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও কল্পনাশক্তির পরিচায়ক।

পৃষ্ঠা—১০১।

পংক্তি—২০। রবীন্দ্রনাথের মতে যদিও স্বভাবতঃ কোমলপ্রাণ বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরের দয়ার কথামাত্র স্মরণ করিয়াই মুগ্ধ হয়, এবং তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা কীর্ত্তন করিতে ভালবাসে, তথাপি দয়া কিংবা বিদ্যাবত্তা তাঁহার চরিত্রের প্রধান গৌরব নহে। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বিশেষত্ব তাঁহার "অজেয় পৌরুষ" ও "অক্ষয় মনুষ্যত্ব"।

পংক্তি—২১। 'অশ্রুপাতপ্রবণ' ঃ—স্বভাব-কোমল,—এত কোমল যে সহজেই অশ্রুপাত করে।

'বাঙালী' ঃ—রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণানুরূপ বর্ণবিন্যাসের পক্ষপাতী। সেই জন্য 'রঙ্গ' না লিখিয়া 'রং' বা 'রঙ্', 'বাঙ্গালা' না লিখিয়া 'বাংলা' বা 'বাঙ্লা', 'চাকরী' না লিখিয়া 'চাক্‌রী' (১০৬ পৃষ্ঠা ১ পংক্তি) 'তেমনি' না লিখিয়া 'তেম্‌নি' (১০৬ পৃঃ ১৪ পংক্তি) 'উঠা' না লিখিয়া 'ওঠা', 'শুনা' না লিখিয়া 'শোনা' লিখিয়া থাকেন।

উচ্চারণানুরূপ বর্ণবিন্যাসের প্রথা প্রচলিত করার অল্পাধিক চেষ্টা ইউরোপীয় অনেক সাহিত্যেই করা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও সুধীগণ অদ্যাপি তাহা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। একই শব্দের উচ্চারণ স্থান-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, সুতরাং উচ্চারণকেই বর্ণবিন্যাসের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে, বিভিন্ন জেলা এমন কি একই জেলার বিভিন্নাংশে

এক শব্দের বিভিন্নরূপ বর্ণ-বিন্যাস করিতে হইবে। ইহাতে সাহিত্য-চর্চ্চার একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘাত হইবারই সম্ভাবনা।

পৃষ্ঠা—১০২।

পংক্তি—১। 'প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে' ঃ—অর্থাৎ বিচলিত করিয়া প্রশংসায় প্রবৃত্ত করিতে পারে। এইরূপ প্রয়োগ অনেকটা ইংরেজির অনুকরণ। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হইলেও ইহা ইদানীং বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিতেছে।

পংক্তি—৭। মহিমাশালিনী' ঃ—'মহিমা' সংস্কৃত মহিমন্ শব্দ হইতে লব্ধ, সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে 'মহিমশালিনী' হওয়া উচিত। ৫১ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তির বিবৃতি দেখ।

পংক্তি—১০। 'তারানাথ তর্কবাচস্পতি' ঃ—সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক। ইনি সিদ্ধান্ত কৌমুদী ব্যাকরণ, নানা সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা, এবং 'বাচস্পত্য' নামক বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

পংক্তি—১১। 'মার্শাল' ঃ—কাপ্তান জি, টি, মার্শাল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন, এবং কিছু দিনের জন্য সংস্কৃত কলেজেরও সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইংরাজি শিখিতে ও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিতে উৎসাহিত করেন।

পংক্তি—১৯। 'আজন্ম কালের একটা জিদ' ঃ—বিদ্যাসাগর বাল্যে পিতার অবাধ্য ছিলেন, এবং সকল বিষয়ে নিজের অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন করিতেন।

পংক্তি—২১। 'পৌরুষ মহত্ত্ব' ঃ—পৌরুষ=পুরুষোচিত দৃঢ়তা। পৌরুষ জনিত মহত্ত্ব।

পৃষ্ঠা—১০৩।

পংক্তি—৩। 'তাহা কেবল' ইত্যাদি ঃ—দয়াবৃত্তির আকস্মিক ও উৎকট উত্তেজনায় কোনওরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়া সেই উত্তেজনা-জনিত হৃদয়ের অস্বাচ্ছন্দ্য হইতে মুক্তি লাভ করা।

পংক্তি—৮। 'ঝঞ্চাটে যাইতে' ঃ—ক্লেশ স্বীকার করিতে। পণ্ডিত ৺রামকমল বিদ্যালঙ্কার মনে করেন, এই শব্দ সংস্কৃত ঝঞ্ঝা শব্দ হইতে উৎপন্ন। ঝঞ্ঝা=বাত্যা, ঝড়, ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদি। ঝঞ্চাট শব্দ কথিত ভাষায় খুব প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ রচনায় কথিত ভাষা প্রয়োগের পক্ষপাতী।

পংক্তি—১৭—১৮। 'সামাজিক কৃত্রিম শুচিতা' ঃ—ব্রাহ্মণজাতীয় লোক শুচি, ডোম জাতীয় লোক অশুচি ইত্যাদি রূপ সমাজ-প্রচলিত সংস্কারের অনুগত আচার। ইহাকে কৃত্রিম বলিবার হেতু এই যে, এইরূপ শুচি অশুচি ভেদ মনুষ্যের কল্পিত, ঈশ্বরের চক্ষে ইহার কোনও মূল্য নাই।

পৃষ্ঠা—১০৪।

পংক্তি—৬—৭। 'নাসিকা কুঞ্চন' ঃ—ইহা ঘৃণার চিহ্ন। বসন তুলিয়া (নাকে) ধরা—ইহাও জুগুপ্সার পরিচায়ক।

পংক্তি—৮। 'ঋজু রেখায়'—ঃ—এইরূপ গতি সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিচায়ক। বক্ররেখায় গমনে অধিকতর সময় আবশ্যক হয়. তাহাতে মতির দৃঢ়তা হানির সম্ভাবনা থাকে।

পংক্তি—১৫। 'অন্নচ্ছত্রে' ঃ—'চারিত্র পূজায়' এইরূপই আছে ; বস্তুতঃ অন্নসত্র হওয়া উচিত। সত্র=সদাব্রত, সদাদান।

পৃষ্ঠা—১০৫।

১১০। চক্ষুলজ্জা ঃ—চক্ষুঃ+লজ্জা=চক্ষুর্লজ্জা। সংস্কৃত ব্যাক-

রণানুসারে চক্ষুলজ্জা লিখা ভুল। এস্থলে কথিত ভাষার অনুকরণে 'চক্ষুলজ্জা লিখিত হইয়াছে।

পংক্তি—১৬। 'চুল চেরা যায়' ইত্যাদি ঃ—চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থকে চিরিতে পাড়িলে তাহাতে সূক্ষ্মকার্য্যে নিপুণতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাহা সংসারের কোনও কাজে আসেনা, পক্ষান্তরে 'গ্রন্থিছেদনে' সবলতা ও সাহস প্রভৃতি আবশ্যক হয়। রূপক ত্যাগে, চুল চেরা অর্থে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কজাল ও ন্যায়শাস্ত্রের ফক্কিকা (ফাঁকি) বিস্তার বুঝায়, আর গ্রন্থিছেদন অর্থে সাংসারিক জীবনে নানা সমস্যার মীমাংসা বুঝায়। এস্থলে ইংরেজী Hair-splitting ও Cutting the Gordian knot এই দুইটি কথার ভাবানুবাদ করা হইয়াছে।

পংক্তি—১৮—১৯। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া যতই শীঘ্রগামী অতএব উৎকৃষ্ট হউক, উহা বিলাসিতার অঙ্গ মাত্র, কিন্তু, গাড়ীটানা ঘোড়া সংসারে অনেক উপকারে আইসে।

পংক্তি—২০—২১। অনন্যমনা হইয়া ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলনে রত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাংসারিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞতা চিরকালই সাহিত্যে কৌতুক ও হাস্যরসের অক্ষয় ভাণ্ডার।

পৃষ্ঠা—১০৬।

পংক্তি—১২। 'আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তি' ঃ—প্রকৃতি নিষ্পন্ন বর্দ্ধিষ্ণুতা, 'কঠিন'=যাহা কোনরূপ প্রতিকূল শক্তির বাধায় প্রতিহত হয় না।

পংক্তি—১৩—১৪। এই স্থানের ভাষা ইংরেজীর অনুরূপ। ইহার অর্থ এই যে, বৃক্ষটি প্রচুরশাখাপল্লবসম্পন্ন হইয়া এবং সরল ও অভ্রভেদী (গগনস্পর্শী) উচ্চতা লাভ করিয়া নিজ মহিমা প্রকটিত করে।

পংক্তি—১৬। 'মজ্জাগত' ঃ—স্বাভাবিক।

পংক্তি—১৭। 'প্রবল' ঃ—চরিত্রবলশালী।

পংক্তি—২২। 'লোক হিতৈষা' ঃ—লোকের হিত করিবার ইচ্ছা। 'লোক হিতৈষণা'ও লিখা হয়। লোক—হিত—ইষ+অঙ্‌ স্ত্রীলিঙ্গে আ।

'সজাগ' ঃ—জাগ্রৎ।

পৃষ্ঠা—১০৭।

পংক্তি—১১—১২। এ স্থলে 'গতি' ও 'নীতি' তে একটু প্রভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যেন প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়াই নিজ মত প্রতিপাদন করিতেছেন,। বস্তুতঃ ধর্ম্মের গতি ও ধর্ম্মনীতি এই উভয়ে কোনও বিশেষ প্রভেদ নাই। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা-গতিঃ (অর্থাৎ ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম) এই কথার ভাব এই যে, কোন্‌টি ধর্ম্ম ও কোন্‌টি অধর্ম্ম অনেক সময়ে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, কোন্‌টি ধর্ম্মসঙ্গত ও কোন্‌টী ধর্ম্মসঙ্গত নয় তাহা আমা-দের স্বাভাবিক ধর্ম্মবোধ বা "বিবেক" দ্বারা অতি সহজেই নির্দ্ধারণ করা যায়।

পৃষ্ঠা—১০৮।

পংক্তি—২১—২৩। "প্রয়াগ, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থানে এক একটী বটবৃক্ষ রোপিত আছে। প্রবাদ এই যে, ঐ সকল বৃক্ষে জলসেক এবং পূজা করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়।"—৺রামকমল বিদ্যালঙ্কার। প্রয়াগের অক্ষয় বটই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। হিউএনথ সঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও ইহার উল্লেখ আছে। 'তীর্থস্থান' ইত্যাদি ঃ—বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙ্গালী জাতির পূজাযোগ্য।

দীনেশচন্দ্র সেন।

জন্ম—১২৭৩ সাল (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ), নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুয়াপুর গ্রাম। একমাত্র পুত্র বলিয়া দীনেশচন্দ্র শৈশবে মাতাপিতার অতি আদরের ছেলে ছিলেন। তাঁহার ১১ জন সহোদরা জন্মগ্রহণ করেন। দীনেশচন্দ্র বর্ণপরিচয়ের পূর্ব্বেই কৃত্তিবাসের রামায়ণের অনেকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা ঢাকা কলেজে সম্পূর্ণ হয়। তিনি বি, এ, পরীক্ষায় ইংরাজিতে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিনের জন্য শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত হবিগঞ্জ স্কুলে ও পরে কুমিল্লায় শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তৎপর পারিবারিক শোক ও 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ইতিহাসসঙ্কলনার্থ গুরুতর পরিশ্রম হেতু শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই সময় হইতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক ২৫৲ বৃত্তি দান করিতেছেন। ইদানীং দীনেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালাপরীক্ষক ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক "রীডার"।

দীনেশচন্দ্র বাল্যকাল হইতে কলেজে পাঠাবস্থা পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এখন তিনি যাহা লিখেন তাহা গদ্যেই লিখিয়া থাকেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর নাম ঃ-- 'কুমার ভূপেন্দ্রসিংহ' (কাব্য), 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'তিনবন্ধু', (গল্প), 'রামায়ণী কথা' 'সতী', 'বেহুলা', 'ফুল্লরা', 'জড় ভরত' প্রভৃতি।

পৃষ্ঠা—১১০।

পংক্তি—১৯। মুসলমানগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতেই ভারতাক্রমণ আরম্ভ করিলেও মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতবিজয় প্রকৃত পক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই।

পংক্তি—২০। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ঃ—বর্ত্তমান কামরূপ জেলা। ইহা খুব প্রাচীন দেশ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা এইস্থানে থাকিয়া নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহার নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ। (অত্রৈব হি স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্‌নক্ষত্রং সসর্জ হ। ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরী সমা॥)

পৃষ্ঠা—১১১।

পংক্তি—১। ঃ—'সারস্বত' ঃ—সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী দেশ। ইহার অপর নাম কুরুক্ষেত্র। সরস্বতী নদী রাজপুতনার মরুভূমিতে ইদানীং লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

'কান্যকুব্জ' ঃ—কান্যকুব্জ দেশের রাজধানী কান্যকুব্জ বা কন্যাকুব্জ বর্ত্তমান কালে কনোজ নামে অভিহিত। কথিত আছে, পবন দেব শাপ দিয়া এস্থানের কন্যাগণকে কুব্জ করিয়াছিলেন।

'গৌড়' ঃ—মান্ধাতার দৌহিত্র গৌড়ের নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। গৌড়ের ভগ্নাবশেষ এখন মালদহ জেলার অন্তর্গত। প্রাচীন গৌড় রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত দেশভাগের নাম গৌড় দেশ। কবিকঙ্কণও গৌড় দেশ হইতে পৃথক্‌রূপে বঙ্গদেশের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্ভোজভৃঙ্গ, গৌড় বঙ্গ উৎকল অধীপ।"

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ় দেশ (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলা) গৌড়ের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

'মিথিলা' ঃ—বর্ত্তমান ত্রিহুত। নিমির পুত্র মিথির নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়।

'উৎকল' ঃ—উড়িষ্যা।

পংক্তি—২।পঞ্চগৌড়ের এই বিভাগ স্কন্দপুরাণের সহ্যাদিখণ্ডে উল্লিখিত আছে, যথা—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

পংক্তি—২। 'প্রভাবব্যঞ্জক':—গৌড়ের নামানুসারে এই পঞ্চ রাজ্যের নামকরণ হওয়ায় ইহাদের মধ্যে গৌড়েরই প্রাধান্য দ্যোতিত হইতেছে।

পংক্তি—৬। 'বৃটওয়াল্ডা':—এই শব্দের অর্থ 'ব্রিটেনের শাসন কর্ত্তা'। নর্ম্মাণ বিজয়ের পূর্ব্বে ব্রিটেন দেশ সপ্ত রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহাদিগের সাধারণ নাম হেপ্টার্কি (Heptarchy) বা সপ্তরাজ্য। এই সপ্তরাজ্যের মধ্যে কোনও রাজ্যের অধিপতি অপর ছয় রাজ্যের রাজগণ কর্ত্তৃক "প্রধান" বলিয়া স্বীকৃত হইলে তিনি বৃটওয়াল্ডা (Bretwalda) উপাধি লাভ করিতেন। *

পংক্তি—২০। "স্তুতিজীবিগণ':—ভাট প্রভৃতি বা রাজসভাস্থ বন্দিশ্রেণীর লোক। "বন্দিনঃ স্তুতিপাঠকাঃ।"

পংক্তি—২৩। "সর্ব্বনেশে":—যথা "কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে, আর বামুন ঘেঁসে, এই তিন সর্ব্বনেশে।" (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-প্রণীত Old Bengali Literature নামক পুস্তিকা।)

পৃষ্ঠা—১১২।

পংক্তি ২। 'রৌরব':—যথা:—অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ ও রামচরিত বাঙ্গালায় শ্রবণ করিলে রৌরব নরকে যাইতে হয়।

---

* [সপ্তরাজ্যের নাম যথা:--Kent, Sussex, Wessex, Essex, East Anglia, Mercia, ও Northumbria]

পংক্তি—৩। 'ললিত' ইত্যাদি:—ইহা কবি জয়দেব প্রণীত একটি প্রসিদ্ধ গানের প্রথম ছত্র। সমস্ত পদটি বসন্তের বিশেষণ। ইহার অর্থ,—অতি সুন্দর লবঙ্গ-লতা আলিঙ্গন করা হেতু স্নিগ্ধ দক্ষিণ বায়ু যুক্ত (বসন্তকাল)।

পংক্তি—৫—৬। 'তৈলাধার পাত্র' ইত্যাদি :—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের 'আষাঢ়ে' নামক ব্যঙ্গকাব্যে এই দুইটি কথা লইয়া অতিশয় হাস্যকর একটি কবিতা আছে ; তাহার প্রথম দুই ছত্র এই :—

এক দিন ভট্টপল্লীতে মহাতর্ক হৈল।
তৈলাধারই পাত্র কিংবা পাত্রাধারই তৈল ॥

'তৈলাধার পাত্র' ও 'পাত্রধার তৈল' এই কথা দুইটিতে বস্তুতঃ তৈল ও পাত্রের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধের কোনও ব্যতিক্রম নাই। উভয়ত্রই তৈল আধেয় ও পাত্র আধার। (তৈলাধার=তৈলের আধার। পাত্রাধার=পাত্র আধার যাহার।) তথাপি একবার আধেয়কে বিশেষ্য ও আধারকে বিশেষণ, আবার আধারকে বিশেষ্য ও আধেয়কে বিশেষণ করিয়া একটা শুষ্ক ন্যায়ের ফাঁকি রচনা করাতে ইহা উপহাসের বিষয় হইয়াছে।

পংক্তি—৭। 'নৈষধ' :—মহাকবি শ্রীহর্ষ-প্রণীত নৈষধচরিত কাব্য। সূক্ষ্মগ্রন্থি মোচন :—সন্দেহ ও সমস্যার নিরাকরণ।

পংক্তি—১৫। 'ইরাণ' :—পারস্য দেশ। 'তুরাণ' :—তুর্কিস্থান ইহার ব্যুৎপত্তি গত অর্থ, পারস্যবহির্ভূত। সেশানীয় রাজগণ স্বীয় সাম্রাজ্যের পারস্য-বহির্ভূত অংশকে এই নামে অভিহিত করিতেন। বর্ত্তমান কালেও পারস্য দেশে তুর্কিস্থানের সর্ব্বসাধারণ পরিচিত নাম তুরাণ।

পৃষ্ঠা—১১৩।

পংক্তি—৮। পরাগল খাঁ গৌড়াধিপতি হুসেন সাহের (১৪৯৪-

১৫২৫) সেনাপতি ছিলেন। ইনি হুসেন সাহ কর্ত্তৃক মগদিগকে চট্টগ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রেরিত হয়েন। চট্টগ্রাম জোরওয়ারগঞ্জ থানার অধীন পরাগলপুরে পরাগল খাঁর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে।

পংক্তি—৯। 'উল্লেখ' ঃ—যথা ঃ —

শ্রীযুক্ত নায়ক সে যে নসরত খাঁ।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥
(বঙ্গভাষাও সাহিত্য—১২১পৃঃ পাদটীকা)

'বিদ্যাপতি' ঃ— সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। ইনি মিথিলাবাসী ছিলেন। জন্ম ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু ১৪৮১ খৃষ্টাব্দ। বিদ্যাপতি কৃত নসিরা সাহের উল্লেখ যথা ঃ—

"সে যে নসিরা সাহ জানে।
যারে হানিল মদন বাণে।" ইত্যাদি
(বঙ্গভাষাও সাহিত্য ১২২ পৃষ্ঠা পাদটীকা)

পংক্তি—১৯।মালাধর বসু কৃত ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদের নাম "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"। এই অনুবাদের তারিখ ১৪৭৩—১৪৮০ খৃঃ।

পৃষ্ঠা—১১৪।

পংক্তি—১২। ত্রিপুর নৃপতি ঃ--ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন মাণিক্য। "ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, সে গুলি ছুটিখাঁর পদে পুষ্পবিল্বদলে অর্চ্চনা। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন এ গুলা ঝুঁটা ফুলের অঞ্জলি।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৬৪-৫ পৃষ্ঠা)

পংক্তি—১৭। 'আলওয়াল' ঃ---মুসলমান কবি। দীনেশ বাবু অনুমান করেন, ইনি ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতী কাব্য মীরমহম্মদ নামক কবি কৃত হিন্দী 'পদ্মাবৎ কেচ্ছার' অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

জন্ম---১২৭১ সাল (১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ), জন্মস্থান--মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমো গ্রাম। ইনি বাল্যকালে স্বগ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে বিদ্যারম্ভ করেন ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারপূর্ব্বক বৃত্তিলাভ করিয়া কান্দি স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। রামেন্দ্র সুন্দর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম, এফ্ এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয়, বি, এ, ও এম্ এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে প্রথম স্থান লাভ করেন। তৎপরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রিপণ কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপকতা গ্রহণ করিয়া ইদানীং ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ছাত্রাবস্থায় ‘নবজীবন’ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। কলেজত্যাগের পর সাধনা প্রভৃতি নানা মাসিক পত্রে ইঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও তিনি মাসিকপত্রে সময় সময় লিখিয়া থাকেন। ১৩০৫—১৩১০ সাল পর্য্যন্ত ইনি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, বর্ত্তমানে ইনি সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক। পিতার নিকট হইতে রামেন্দ্রসুন্দর স্বধর্ম্মে আস্থা ও প্রবল বিদ্যানুরাগ লাভ করেন। নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইনি লিখিয়াছেন “বাঙ্গালা সাহিত্যের ও তদ্দ্বারা স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা করিয়া জীবন শেষ করি এই প্রার্থনা”। (বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত ‘বাঙ্গালা ভাষার লেখক’, ৮০৩ পৃষ্ঠা।)

পৃষ্ঠা—১১৬।

পংক্তি—১৩। ‘আন্দাজ’ ঃ—পার্শী শব্দ ; ইহার অর্থ অনুমান।

পংক্তি—১৪। ‘ভূমিষ্ট (?)’ ঃ—পৃথিবীর জন্ম অর্থে এস্থলে পৃথিবীতে প্রথম মৃত্তিকাস্তরের গঠন বুঝিতে হইবে। ভূমির উৎপত্তি

সম্বন্ধে 'ভূমিষ্ঠ' শব্দ ভাল খাটে না বলিয়া একটি সন্দেহবোধক চিহ্ন (?) দেওয়া হইয়াছে।

পংক্তি ১৯—২০। অর্থাৎ, পক্ক কেশ, লোল চর্ম্ম, ও দন্তহীনতা এইগুলির উপর নির্ভর করিয়া বৃদ্ধলোকের বয়স নির্দ্ধারণ অসাধ্য নহে।

পৃষ্ঠা—১১৭।

পংক্তি—৭। 'ছয় হাজার বৎসর মাত্র' ঃ—খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে খৃষ্টের জন্মের ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

পংক্তি—১৭। 'গাছ পাথর নাই' ঃ—অর্থাৎ অনুমানের অতীত। ইহা জীববিদ্যা ও ভূবিদ্যায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মত।

পংক্তি—১৮। 'কালিকার কথা' ঃ—অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি যত কাল পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিয়া ভূবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন তাহা তত পূর্ব্বে হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপে নিউকুম্ব ও হোলডেন নামক জ্যোতির্ব্বিদ্‌দ্বয়ের মত উল্লেখ করা যাইতে পারে। * ইঁহারা বলেন পৃথিবীর উৎপত্তি দুই কোটী বৎসর অপেক্ষা বড় বেশি দিনের কথা নয়।

পৃষ্ঠা—১১৮।

পংক্তি—৮। 'হৃৎস্পন্দন' ইত্যাদি ঃ—এস্থলে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কথা বলা হইতেছে।

পংক্তি—১৫। 'ভাইভগিনীর' ঃ—প্রাচীনকালীন জীবের। 'জননী বসুন্ধরা'র সম্পর্কে পৃথিবী-পৃষ্ঠচারী সমস্ত জীবই মানুষের সহোদর বা সহোদরা।

---

* It must have a beginning within a certain number of years which we cannot yet calculate with certainty but which cannot much exceed 20,000,000.—Newcomb and Holden's *Astronomy*.

পৃষ্ঠা—১২১।

পংক্তি—১২। 'মানুষের নিকট জ্ঞাতি' ঃ—এই মত জগদ্বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ্ চার্লস রবার্ট ডারউইন কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে জীবের ক্রমোন্নতির পরিণতিতে মানুষের উৎপত্তি।

পংক্তি—২০। 'অতি সামান্য জীবাণু' ঃ—ইহার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক নাম প্রটোপ্লাজম (Protoplasm).

পৃষ্ঠা—১২২।

পংক্তি—৭। সার উইলিয়ম টমসন ঃ—বা লর্ড কেলবিন ; ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জন্ম—১৮২৪ খৃষ্টাব্দ। ভূমণ্ডলের প্রলয়সম্বন্ধে ইনি নানা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর মত প্রকাশ করিয়াছেন। 'প্রকৃতি' ১৮০—১৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মৃত্তিকাস্তরের উৎপত্তি সম্বন্ধে লর্ড কেলবিনের মত ইদানীং পূর্ব্ববৎ আদৃত হয় না। পৃথিবীর বয়স প্রবন্ধের পাদটীকায় রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন, "অধুনা রেডিয়ম নামক অদ্ভুত ধাতুর আবিষ্কারের ফলে লর্ড কেলবিনের হিসাব উলট পালট হইয়া গিয়াছে।"

পৃষ্ঠা—১২৩।

পংক্তি—৯। লর্ড কেলবিনের শিষ্যস্থানীয় জর্জ্জ ডারুইনও এই মতের সমর্থক।

পংক্তি—১৭। সূর্য্যের তাপের উৎপত্তিসম্বন্ধে নানা মত আছে। অনেকের মতে অতিপ্রাচীনকালে সূর্য্যমণ্ডল সৌরজগতের সীমান্ত পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে প্রসারিত ছিল। কালক্রমে তাহা নিজ গতিবেগে সঙ্কুচিত হইতে থাকে। এই সঙ্কোচনই তাপ বিকিরণের কারণ।

পৃষ্ঠা ১২৪।

পংক্তি—১৭। 'টেট' ঃ—সুবিখ্যাত বিজ্ঞানাধ্যাপক। ধূমকেতুর অবয়ব সম্বন্ধে ইঁহার মত বৈজ্ঞানিক সমাজে খুব আদৃত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা—১২৫।

পংক্তি—১৬। হক্সলি ঃ—জন্ম—১৮২৫ খৃষ্টাব্দ; মৃত্যু—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ। ইনি বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার পারদর্শী ছিলেন বলিয়া ইহাকে "সর্ব্বজ্ঞ হক্সলি" বলা হইত।

রামপ্রাণ গুপ্ত।

জন্ম—১২৭৫ সাল (১৮৬৯ খৃঃ), নিবাস—ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কেদারপুর গ্রাম। দেশে ইঁহাদের বংশ মুন্সীবংশ বলিয়া খ্যাত। ছাত্রাবস্থায়ই রামপ্রাণ কোচবিহার হইতে প্রকাশিত 'সুকথা' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নসমাপ্তির পর ইনি অক্লান্তভাবে সাহিত্যচর্চ্চা করিতেছেন। ইঁহার রচিত বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, সাহিত্য, ভারতী, প্রবাসী, আরতি ও নবনূর পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। ইঁহার কয়েকখানা গ্রন্থের নাম,—'রিয়াজ উস সালাতিন', 'মোগল বংশ', 'পাঠান রাজবৃত্ত', 'হজরত মোহাম্মদ' ইত্যাদি। ইস্‌লাম প্রতিষ্ঠাবিষয়ক প্রবন্ধ শেষোক্ত পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা—১২৯।

পংক্তি—৪। 'মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন' ঃ—একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর দশম হিজরীর জেলকদ মাসে মহম্মদ মক্কায় গমন করেন। তথা হইতে ফিরিবার পরই তাঁহার নিজের পীড়া হয়।

পংক্তি—১০। 'আবুবকর' ঃ—মহম্মদের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ শিষ্য। ইঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া মহম্মদ প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। কোরেশগণের অত্যাচারে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় পলায়নকালে আবুবকর যেরূপ প্রভুভক্তি প্রদর্শন করেন, ইসলামের ইতিহাসে তাহা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

পংক্তি—১৩। 'আলী' ঃ—মহম্মদের অন্যতম বিশ্বস্ত শিষ্য। ইনি যেমন প্রভুভক্ত তেমনি বীর ছিলেন। যানা পর্ব্বতের পাদদেশে কোরেশগণের সহিত যুদ্ধে ও খয়বারের ইহুদিগণের সহিত যুদ্ধে ইনি প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করেন।

'আব্বাস' ঃ—ইনি মহম্মদের পিতৃব্য।

পংক্তি—১৭। ইতিপূর্ব্বে ইত্যাদি ঃ—মহম্মদ দায়ুদ (David) মুশা (Moses) ইব্রাহিম (Abraham), ঈশা (Jesus) প্রভৃতিকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম খৃষ্টানগণের বাইবেলের (বিশেষতঃ Old Testament এর) উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই বলা যাইতে পারে।

'পয়গম্বর' ঃ—ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ।

পৃষ্ঠা—১৩০।

পংক্তি—৮। মহম্মদের শেষ কথার অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিলে এইরূপ হয়, "হে ঈশ্বর, তাহাই হউক। এখন হইতে স্বর্গের জ্যোতির্ম্ময় অধিবাসী দলে (বাস করিব)।" মহম্মদের মৃত্যুর তারিখ ৬৩২ খৃষ্টাব্দ ৮ই জুন, সোমবার।

পংক্তি—২০। 'প্রত্যাদেশ'ঃ—ঈশ্বরের আদেশ। (ইহা ইংরেজি revelation শব্দের অনুবাদ।) এই প্রত্যাদেশ কোরাণের ৪র্থ সুরায় উল্লিখিত আছে। যথা—"অতএব পরমেশ্বরের পথে সংগ্রাম কর, তুমি জীবনে ব্যতীত প্রপীড়িত হইবে না, এবং বিশ্বাসীদিগকে

উত্তেজিত কর, সত্বরেই ঈশ্বর কাফেরদিগের সমর বন্ধ করিবেন। ঈশ্বর যুদ্ধ বিষয়ে সুদৃঢ় ও শান্তি বিষয়ে সুদৃঢ়" (গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদ)।

পৃষ্ঠা—১৩১।

পংক্তি—৮। 'ইস্‌লাম' এই শব্দের অর্থ ঈশ্বরের আনুগত্য।

সৈয়দ আমীর আলি একস্থলে লিখিয়াছেন :—It means peace, greeting, safety, salvation.

পংক্তি—১৪। 'কোরেশ' :—মক্কাধিবাসী এক আরববংশের নাম। মহম্মদ স্বয়ং কোরেশবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশ অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিল। কোরেশগণ মক্কার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন ভজনালয় 'কাবার' পুরোহিত ছিলেন। *

পংক্তি—১৬। "দুর্দ্ধর্ষ আরবজাতিকে ইস্‌লাম ধর্ম্মমূলক নৈতিক ও সামাজিক অনুশাসনের সম্যক্ অনুগত করিবার জন্য রাজশক্তির প্রয়োজন ছিল। এজন্য মোহাম্মদ নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমণ্ডলীকে রাজশক্তি-সম্পন্ন করিয়া এক প্রজাতন্ত্র রাজ্যের সূত্রপাত করিলেন। ... ... মোহম্মদ আপনাকে মণ্ডলীর অধিনেতৃপদে স্থাপিত করিলেন।" (হজরত মোহাম্মদ ২৬—২৭ পৃষ্ঠা।)

পৃষ্ঠা—১৩২।

পংক্তি ৫। 'হোদয়বিয়ার সন্ধি' :—এই সন্ধি ১০ বৎসরের জন্য স্থাপিত হয় কিন্তু ইহা দশবৎসর-স্থায়ী হয় নাই।

---

* কোরেশগণের উৎপীড়ন সম্বন্ধে Colonel Kennedy বলেন :—He (Muhammad) allowed himself to be abused, to be spit upon, to have dust thrown upon him, and to be dragged out of the temple by his own turban fastened to his neck.

পৃষ্ঠা—১৩৩।

পংক্তি—৮। 'তেত্রিশ বার' ঃ—কোনও কোনও লেখকের মতে ১০১ বার, কাহারও মতে মাত্র ১৯ বার। (হজরত মোহাম্মদ ৫১ পৃষ্ঠা, পাদটীকা।)

পৃষ্ঠা—১৩৪।

পংক্তি—৬—৭। চীন, মালয় ও এশিয়ার নানা দ্বীপে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারে তরবারির সাহায্য আবশ্যক হয় নাই। পারশ্যদেশেও তরবারি অপেক্ষা ইস্‌লামের গুণাবলীই তাহার প্রতিষ্ঠার কারণ হইয়াছিল, ইহা মুসলমানদ্বেষী লেখকগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পৃষ্ঠা—১৩৫।

পংক্তি—৪। ইস্‌লামের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে আরবীয় সমাজে দাস-দাসীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।

পংক্তি—১৮। 'হস্তমর্দ্দন' ইত্যাদি ঃ—ইংরেজ লেখকগণও মহম্মদের সৌজন্য ও নির্ভীক তেজস্বিতা ও সত্যপ্রিয়তার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন।*

* Mr. Stanley Lane-Poole লিখিয়াছেন ঃ—

"There is something so tender and womanly and withal so heroic about the man that one is in peril of finding the judgment unconsciously blinded by the feeling of reverence and well nigh love that such a nature inspires. He who standing alone, braved for years the hatred of his people, is the same who was never the first to withdraw his hand from another's clasp......"